খড়ির লিখন

সুকান্ত

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৬৫
জুলাই, ১৯৫৮

প্রকাশক :
জে. এন. সিংহ রায়
নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ
২২, ক্যানিং স্ট্রীট
কলিকাতা-১
প্রচ্ছদপট :
অজিত গুপ্ত
মুদ্রক :
রণজিৎকুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩, লোয়ার সারকুলার রোড
কলিকাতা-১৪

দু'টাকা পঞ্চাশ নয়াপয়সা

উৎসর্গ

বাংলাদেশের শিক্ষয়িত্রীদের করকমলে

স্কুলরুটিনের বাইরে স্বল্প অবকাশ ; তারই ফাঁকে জীবনকে দেখেছি। কতটুকুই বা তার সীমা! তবু তার মধ্যে ছলনা নেই। 'খড়ির লিখন'-এর পটভূমিকায় আমার শিক্ষয়িত্রী জীবনের স্মৃতি-বিস্মৃতির সেই কাহিনীগুলিকে ধরে রাখবার চেষ্টা করেছি।

—সুকন্যা

KHARIR LIKHAN

A fiction

by

Sukanya

স্মৃতির লিখন

জীবনের পথে চলতে গিয়ে হঠাৎ থমকে যাই, দাঁড়িয়ে পড়ি কয়েকটি মুহূর্তের জন্য। কে যেন পিছু ডাকে। তাকে দেখতে পাই না, শুধু আকর্ষণ অনুভব করি। কিন্তু তার ইঙ্গিতে সাড়া দেবার অবকাশ কোথায়? চলিষ্ণু বর্তমানের উদ্দাম স্রোতে ভেসে চলেছি আমরা। আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে চরৈবেতি, চরৈবেতি। এগিয়ে যাই। আত্মপরিক্রমা দীর্ঘায়ত হয়ে পড়ে।

মনে পড়ে রূপকথার সেই ভয়াবহ দৈত্যের কাহিনী। ঠাকুরমার বুকে মুখ লুকিয়ে শুনতাম। চারচোখো সেই দৈত্য, প্রকাণ্ড তার চেহারা। দুটো চোখ তার সামনে, আর দুটো পিছনে। সামনের দুটি দিয়ে সে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে যায় ভবিষ্যতের পথে, আর পিছনের দুটি মায়ালোকে ছায়া ফেলে চলে। অতীতের তিমির-তীর্থ পার হয়ে, বর্তমানের নিশ্ছিদ্র মুহূর্ত স্পর্শ করে তার দৃষ্টি চলে ভবিষ্যতের অনন্ত সম্ভাবনার দিকে। সেই দুর্লভ অতীত-ভবিষ্যৎ-সঞ্চারী শক্তি তো আমার নেই।

আজ জীবনের দীর্ঘপথ বেয়ে অনেক দূরে এসেছি। সামনের দুটি চোখ দিয়ে প্রাণভ'রে দেখে নিয়েছি বিশ্বের বিচিত্র রূপ। তাই পিছনের দৃষ্টি না থাকলেও নেপথ্যচারী জীবনটা যেন মাঝে মাঝে সাজঘরের পর্দা তুলে প্রকাশ্য নাটমঞ্চে বেরিয়ে আসতে চায়।

চাকরি-জীবনের কয়েকটি বছর কেটে গেল। মহাকালের অযুত বর্ষ-পরিক্রমায় অসংখ্য পরমাণুপুঞ্জের একটি অণু এই ক'টি বছর। এরই মধ্যে জেনেছি অনেক; জীবনের পাত্র ভরে উঠেছে

কত ফেনিল অভিজ্ঞতায়। তার কোনটি অশ্রু-টলমল, কোনটি পুলকে আরক্তিম। জীবনের লেজারখানা ডেবিটে-ক্রেডিটে মিলে শেষ পর্যন্ত ব্যালেন্স-শিটেও উদ্বৃত্ত রেখেছে প্রচুর, জমার ঘরে সঞ্চিত হয়েছে অনেক।

স্কুলের নিকষ-কালো ব্ল্যাক-বোর্ডে সাদা খড়ির দাগ কেটে ইতিহাসের সন-তারিখ লিখেছি, ব্যাকরণের সন্ধি-বিচ্ছেদ ঘটিয়েছি, করেছি ইংরিজী-বাংলা শব্দের অর্থভেদ, আরও কত কি! লিখেছি, ডাস্টার দিয়ে আবার মুছেছি। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতার পুঁথি তো খড়িতে লেখা ব্ল্যাক-বোর্ড নয়। সে যে শিলালিপি; কালের ব্যবধানে তা ক্ষয়ে গিয়েছে, অস্পষ্টও হয়েছে, কিন্তু মুছে যায়নি।

প্রত্নতাত্ত্বিকের মতো তার পাঠোদ্ধার করে চলেছি।

এম-এ পাশ করে বাড়িতে বসে ছিলাম, শরীর মন জড়তার জালে হাঁপিয়ে উঠছিল, হতাশ হয়ে পড়ছিলাম খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে একটির পর একটি দরখাস্তের শব্দভেদী বাণ ছুঁড়ে ছুঁড়ে। অবশেষে শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গরখানাকেই যখন সার বলে জানবার চেষ্টা করছি, ঠিক সেই সময় এক শুভমুহূর্তে ভাগ্যদেবী আমার দিকে তাকিয়ে ঈষৎ হাস্য করলেন। আমার বিনীত আবেদন একটা লক্ষ্যে আঘাত করল। দুরু দুরু বুকে লম্বা অফিস-খামের ভিতর থেকে যখন ইণ্টারভিউ-এর আমন্ত্রণ লিপিখানা টেনে এনে বার বার পড়লাম, তখন শীতের রোদের মিঠে আমেজের মতোই ভারি একটা খুশিতে মন ভরে উঠল।

শহরতলীর একটা স্কুলে সহকারী শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন। সম্পাদক আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন তাঁর বাড়িতে।

সকাল আটটায় বিচিত্র অনুভূতি নিয়ে খুঁজে খুঁজে ঠিকানা বার করলাম। বিরাট স্কুলের বিরাট সম্পাদক। জাঁদরেল তাঁর বাড়ি। গেটের গায়ে ইংরিজী, বাংলা আর হিন্দী—এই তিন ভাষায় লেখা 'কুকুর হইতে সাবধান।' খানিকটা পিছিয়ে এলাম—প্রথমেই কুকুর? ভিতরে যাবো কিনা ভাবছি; এমন সময় গেটের বাঁ পাশে কোণের দিকে আবিষ্কার করলাম ইলেকট্রিক কলিং

বেলের বোতাম। বোতামটি টিপে ধরতেই দরোয়ানের আবির্ভাব। এক পলকে আমাকে দেখে ভিতরে নিয়ে গেল মোগলাই সম্ভ্রমে। বুঝলাম আগের থেকেই দরোয়ানকে আমার আগমন সম্বন্ধে খবর দেওয়া ছিল।

সেক্রেটারীর ব্যক্তিগত ঘরে গেলাম। প্রকাণ্ড ঘরে মস্ত বড় টেবিলের ওপাশে বসে আছেন তিনি এবং ঠিক তাঁরই পাশে অধিষ্ঠিতা প্রধানা শিক্ষয়িত্রী। আমাকে দেখে দুজনেই অভ্যর্থনা করলেন, আমার জন্যই নাকি তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন।

আমার বুকে তখন 'বিকিনী'র মহড়া চলেছে। যে সব সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর তালিম দিয়ে এসেছিলাম, সময় বুঝে সব যেন গা ঢাকা দিলো। সকলের অজ্ঞাতসারে শুষ্ক অধরোষ্ঠ লেহন করে নিলাম, ডিসেম্বরের শীতেও তাপাধিক্য অনুভব করলাম।

প্রশ্নবাণ বর্ষিত হলো বহু, দু'চারটে তার অবান্তর। রেফারেন্স-বাগীশ সম্পাদক খুঁটিয়ে জেনে নিলেন অনেক কিছু। পারিবারিক আভিজাত্যের দিকে তাঁর যে বিশেষ লক্ষ্য আছে, কৌশলে তাও জানাতে ভুললেন না। আমি যে-পাড়ায় বাস করি, সেখানকার দু'তিনজন কীর্তিমানের নাম করে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁদের সঙ্গে আলাপ আছে কিনা।

আমতা আমতা করে অগত্যা বলতে বাধ্য হলাম, 'মানে—তাঁরা আমাকে চেনেন না, তবে আমি তাঁদের খুবই···' ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেক্রেটারী ঈষৎ মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললেন, 'সেবার পুজোর সময় আমরা সবাই নাইনিতালে মিট্ করেছিলাম—খুবই এন্‌জয় করেছিলাম।'

বোধ করি সেদিনকার কথা মনে করেই তিনি একটু হাসলেন, তাড়াতাড়ি আমিও বিনীত হাসি হেসে নিলাম।

কথার ফাঁকে ফাঁকে দেখে নিলাম ঘরের চারদিক। একপাশে মাটিতে লাল রঙের পুরু কাশ্মীরী কার্পেট পাতা; তার ওপর ছোট নিচু কাশ্মীরী কাজ করা কাঠের একটি গোল টিপয়, তার চারপাশে মূল্যবান ও সুদৃশ্য সোফা সেট। পাশে ম্যাণ্টল পিসের ওপর একটি ঘড়ি; প্রতি আধঘণ্টা অন্তর সুরের ঝঙ্কার

তুলে সময়ের হিসেব সম্বন্ধে সবাইকে সচেতন করছে। একপাশে রয়েছে সুন্দর করে গোছানো রঙিন চিত্র-সম্বলিত কতকগুলি পত্রিকা। পরে জেনেছিলাম, সেগুলি হরেকরকম মেশিনের নানাবিধ পার্টসের সচিত্র তালিকা।

মাঝখানের টিপয়টির ওপর ছ'খানা ইংরেজী আর একখানা বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র। দেয়ালের এক কোণে জটাজালাচ্ছাদিত মহাদেবের মূর্তি, নির্বিকার চোখে তাকিয়ে আছেন সামনের দিকে। আর এক কোণে একটি ছোট টেবিলের ওপর কাচের ফুলদানিতে রয়েছে একগুচ্ছ টকটকে লাল গোলাপ। অবশ্য গন্ধ নেই; খানিকটা বিবর্ণও বটে; কাগজের ওপর রং বুলনো ক'দিনই বা থাকে! হালকা সবুজ ডিসটেম্পার করা দেয়ালে সুন্দর ফ্রেমে বাঁধানো খানকয়েক বড় বড় ছবি। সেক্রেটারীর ঠিক মাথার ওপরে তাঁরই নিজের ব্রোমাইড ফটো, সাহেবি পোষাক পরা, মুখখানা হাসি হাসি। তারই ঠিক উল্টোদিকের দেয়ালে আর একখানি বড় ছবি—সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও রাণী মেরি। আমাদের সেক্রেটারী সম্রাটের রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে রায়বাহাদুর খেতাবে সম্মানিত হয়েছিলেন।

পুবদিকের দেয়ালে এক অতিবৃদ্ধার ছবি, নামাবলী গায়ে, ঈষৎ ঝুঁকে বসে আছেন, সামনে কোশাকুশি, হাতে কুঁড়োজালি, ওপারে যাওয়ার দিন গুণছেন। আর একদিকে যারবেদা জেলে বন্দী গান্ধীজির বহু পরিচিত চিন্তান্বিত বিষণ্ণ ছবিটি। পশ্চিমদিকের দেয়ালে দুটো ল্যাণ্ডস্কেপ, হাতে আঁকা নয়, ক্যামেরায় ধরা। ছবি দু'খানির 'ল্যাণ্ড্' এদেশের নয়, সাগরপারের। টেবিলের একপাশে ফটোস্ট্যাণ্ডে সেক্রেটারীর আয়রণ ফাউণ্ড্রির ফটো।

হেডমিস্ট্রেস বললেন, 'আচ্ছা, তা হলে আপনি কবে থেকে জয়েন করতে পারবেন? আমাদের স্কুল খুলছে দোসরা জানুয়ারী। আপনার কোনো আপত্তি নেই তো?'

আপত্তি? সাগ্রহে বললাম, 'না না, আপত্তি আর কি? আমি তো বসে আছি। আপনারা যখনই বলবেন, তখনই জয়েন করব।'

হেডমিস্ট্রেসের মুখে প্রসন্ন পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল।

'আপনার কোনো অসুবিধে হবে না, স্কুলের কাছেই টিচার্স কোয়ার্টার্স। আপনারা দশ এগারজন টিচার দোতলায় থাকবেন। খুব আনন্দে দিন কেটে যাবে।'

সেক্রেটারীর দিকে চেয়ে ঈষৎ হেসে বললেন, 'আর ইনি আমাদের সেক্রেটারী—মানে কর্ণধার। আপনার যখনই কোনো অসুবিধে হবে, তখনই জানাবেন। আর তা' ছাড়া, আমি তো রইলামই।'

পরে একটু হেসে বললেন, 'আমাদের স্কুল ব্যবসাদারী স্কুলের মতো নয়। এখানে আমরা হিউম্যান ভ্যালুজটাই বড় করে দেখি।'

সেক্রেটারী দমকে দমকে হেসে উঠলেন, মেদবহুল দেহটি দুলে দুলে উঠল।

হাড়-কাঁপানো শীতের সকালে ধূমায়িত চা আর সেক্রেটারীর বাড়ির তৈরি গরম সিঙাড়া নতুন চাকরিটার মতোই ভারি মিষ্টি লাগল। বেতন আশী, তার ওপর বিনা ভাড়ায় দোতলায় ডবল সীটেড্ একখানা ঘর। একান্নবর্তী পরিবারে পাঁচ বোনে ঠাসাঠাসি-করে-থাকা একখানা ঘরের তুলনায় প্রায় আকাশের চাঁদ বললেই হয়!

শহরতলীর ঈষৎ অপরিচ্ছন্ন পথের ওপর দিয়ে যখন ফিরছি, তখন কখন যেন ভুলে-যাওয়া এক গানের কলি মনের মধ্যে গুন্‌গুনিয়ে উঠল।

কোলাহলমুখর নগরী। আমার চাকরি তার উপকণ্ঠে। মহানগরীর ইটপাথরের রুক্ষতার স্পর্শ লেগেছে এখানেও। কিন্তু সবুজের সমারোহ নেহাত কম নেই। চারিদিকে তমালতালী বন-রাজিনীলা পৃথিবী, তারই ওপর নীলাঞ্জন আকাশ দিক্‌প্রান্তে আনত। প্রতিদিন দেখেছি, পুব থেকে পশ্চিমে সূর্যদেবের নির্ধারিত পথ-পরিক্রমা; কুহু-রাত্রির তারাভরা আকাশে নিঃসীম স্তব্ধতা, আর শুক্লপক্ষের আলো-ঝিলমিল আলপনা। আচমকা সুর কেটে গিয়েছে যান্ত্রিক হর্নের কর্ণ-বিদারী শব্দে। শহর এগিয়ে এসেছে শহরতলীতে।

স্কুলের গেটের কাছে যখন পৌঁছলাম, তখন এগারটা বাজতে

দশ। স্কুল কম্পাউণ্ডে পা দিতেই দরোয়ান সশব্দে বন্ধ করে দিলো পিছনের গেট। চমকে ফিরে তাকালাম, লোহার কপাট বন্ধ। আর পিছনে ফেরা চলবে না। সে পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে—এবার শুরু হবে অন্য পথ, 'অন্য কোথা অন্য কোনখানে।' বুকটা ভারি হয়ে গলার কাছটা টনটনিয়ে উঠল, ফুরিয়ে গেল আমার প্রথম জীবনের সুন্দর স্বচ্ছন্দ পরিচ্ছেদ, কত হাসি-আনন্দ, কত আশা-পরিকল্পনা-কলরব। সব আজ এই মুহূর্তে নিশ্চল হয়ে গিয়েছে লোহার কপাটের ও দিকে—আর ফেরা চলবে না।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। অনেকখানি জায়গা জুড়ে সুন্দর সবুজ 'লন', তার চারদিকে কেয়ারি-করা সরু ফুলবাগান, তার পাশে মোটা সীমারেখা টেনে দিয়েছে ছাঁটা মেহেদি পাতার গাছ। বাউণ্ডারী ওয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে গন্ধরাজ, টগর, শিউলি, জবা আর বন যুঁইয়ের ঝাড়। গেটের মাথায় আগুন ছড়িয়েছে বোগেন ভিলিয়া।

গোলাপী রঙের দোতলা প্রকাণ্ড বাড়িটার বারান্দার গায়ে কালো সিমেণ্ট দিয়ে বড় বড় করে লেখা চারুসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠাতা স্থানীয় জমিদার, অধুনা স্বর্গতঃ। চারুসুন্দরী তাঁর মৃতা সহধর্মিণী। সুরকি-ঢালা পথ এসে শেষ হয়েছে চওড়া লম্বা এক সার সিঁড়ির গোড়ায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডানদিকে এগিয়ে অফিস, আর হেডমিস্ট্রেসের ঘর। ভারি পর্দা-ফেলা ঘরে অনুমতি নিয়ে ঢুকলাম।

হেডমিস্ট্রেস মিস্ মণিকা রায়, এম-এ, বি-টি, তাঁর আসনেই বসে ছিলেন। আমাকে দেখে সুন্দর এক ঝলক হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন, 'আসুন। আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি। আসতে কোনো অসুবিধে হয়নি ? খেয়ে এসেছেন তো ?'

কথার মধ্যে বেশ একটা সহজ অন্তরঙ্গ ভাব আছে—যেটা ইণ্টারভিউ-এর দিনেই আমার মনকে আকৃষ্ট করেছিল। মণিকা রায়ের বয়স তিরিশের বেশ কয়েক বছর ওদিকে। স্থূল শ্যামবর্ণ, ছোটখাট চেহারা, পাতলা বঙ্কিম ঠোঁট, কালো দুটি চোখ। মুখখানাতে কোমল শ্রী যাই-যাই করেও খানিকটা রয়ে গিয়েছে। সাধারণতঃ আমরা যে বিপুলা ভয়াবহ হেডমিস্ট্রেসকে

জানি, মণিকা রায়ের মধ্যে তার অভাব দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

দোতলার বারান্দা থেকে বহুকণ্ঠ-মিলিত সঙ্গীত ভেসে আসছে। মণিকা রায় বললেন, 'ওপরে প্রেয়ার শুরু হয়েছে। চলুন আপনাকে নিয়ে যাই। সব মেয়েদের এক নজরে দেখে নিতে পারবেন।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে যেতে যেতে সবিনয়ে জানালাম, 'আমাকে 'তুমি' করেই বলবেন। আপনি আমার দিদির মতো—'

সশব্দে হেসে পিঠ চাপড়ে বললেন, 'আরে সে তো আপনা থেকেই হয়ে যেতো! তুমি ভাবছ কেন?'

উঠে গেলাম দোতলায়; দোতলার সিঁড়ি আবার ঘুরে উঠে গিয়েছে তেতলার ছাতে। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে অনেকখানি বারান্দা এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ঠেকেছে। তারই ধার দিয়ে চলে গিয়েছে ক্লাশ-রুমের সারি, দরজার মাথায় লেখা ক্লাশের নাম।

মেয়েরা তদ্গত চিত্তে গেয়ে যাচ্ছিল—

তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে, তুমি ধন্য ধন্য হে।

কয়েকজন শিক্ষয়িত্রী দাঁড়িয়ে আছেন তাদের সামনে, তাঁদের চোখের তারা প্রত্যেকটি মেয়ের মুখে মুখে ফিরছে। মেয়েদের তদ্গত না হয়ে উপায় নেই!

আমি যেতেই সব ক'টি চোখ ফিরল আমার দিকে, কৌতূহলে তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মেয়েদের কৌতূহল সংক্রামিত হলো শিক্ষয়িত্রীদের চোখেও, কিন্তু পরক্ষণেই তা' মিলিয়ে গেল। আবার তাঁরা তাকালেন মেয়েদের দিকে।

মেয়েরা প্রাণপণে গাইতে লাগল 'তুমি ধন্য ধন্য হে।'

চারটেয় ছুটির ঘণ্টা বেজে উঠতেই ছিলা-কাটা ধনুকের মতো মেয়েরা এক ছুটে গেটের ওদিকে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সমস্ত স্কুলের এত মেয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেল। সারাদিনের এত হৈ চৈ, ছুটোছুটি হঠাৎ বন্ধ হয়ে কেমন একটা বিষণ্ণ শান্ত নীরবতা স্কুলে জমাট বেঁধে এল। মনের

সঙ্গে সঙ্গে গোটা শরীরটাও পাখীর পালকের মতো হালকা হয়ে উঠল।

মন্থরগতিতে নিচে নেমে আসছিলাম। হাতে দু'খানা বই আর ব্যাগ। সারাদিন মেয়েদের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দেওয়ার অনাস্বাদিত বিচিত্র অভিজ্ঞতায় মন মধুর রসে ভরপুর। কত আদর্শের স্বপ্নই না সেদিন মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল!

হোস্টেলে যাবার আগে মণিকাদির সঙ্গে একবার দেখা করে যাওয়াটা সঙ্গত মনে করে এগিয়ে গেলাম। পা আটকে গেল দরজার কাছে এসে।

মন-ভোলানো হাসি হাসেন যে মণিকাদি, তিনি তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করছেন, 'লজ্জা করে না আপনার বার বার এই লিভ নিতে? লেখা পড়া শিখেছেন, একটু সামলে চলতে পারেন না!'

কোনো উত্তর এল না।

বুঝলাম, অপরাধী অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছেন। নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল, পা টিপে টিপে ফিরে এলাম।

গেটেব কাছে এসে পিছনদিকে ফিরে দেখি, ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন মলিনাদি। মেয়েদের যিনি অঙ্ক কষান।

কিসের লিভ উনি চাইতে গিয়েছিলেন? মণিকাদি-ই বা অত বকলেন কেন?

টিচার্স হোস্টেল। বাড়িখানা তিনতলা। মাঝের ফ্ল্যাটটিতে টিচারদের থাকতে দেওয়া হয়েছে। ভাড়াটা দেয় স্কুল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলাম নিজের ঘরে। জিভে ঠোঁটে কেমন যেন তেতো ভাব ঠেকছে। বাড়ির জন্য মনটা এক-একবার মুচড়ে উঠছে।

ডবল-সীটেড রুম। দু'জন করে থাকবার একটি ছোট ঘর। দু'দিকে দুটি তক্তপোশ। প্রত্যেকটির মাথার কাছে একটি করে বড় শেল্‌ফ্‌, পাশে ছোট টেবিল, সেই অনুপাতে একটি করে চেয়াব। পায়ের দিকে দেয়ালে দু'টি ব্র্যাকেট পেরেক দিয়ে আটকানো।

আমার রুমমেট শীলা মিত্র। দীর্ঘাঙ্গী, শরীরে মাংসের স্বল্পতা

বিসদৃশ, রক্তহীনতার জন্য গায়ের রং সাদার ধার ঘেঁষে গিয়েছে, হাতে গলায় দুচারটে নীল শিরা উঁচু হয়ে আছে। মুখাকৃতি লম্বা, শীর্ণ; সেই তুলনায় বড় বড় চোখ দুটি একটু বেশি উজ্জ্বল। ঘরে ঢুকেই চোখে পড়ে তাঁর শেল্‌ফে সাজানো নানা মাপের নানা রঙের ওষুধের শিশি-বোতল।

চোখে হাত চাপা দিয়ে নিজের বিছানাটিতে চুপ করে শুয়েছিলেন শীলা মিত্র। পায়ের শব্দে তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন। ঈষৎ লজ্জা-মাখানো হাসি হেসে বললেন, 'এই যে আসুন। স্কুলে ক্লাশের ধাক্কায় কথা বলতে পারিনি—কিছু মনে করবেন না।'

সমস্ত ক্লান্তি দূরে সরিয়ে রেখে হেসে বললাম, 'না না, আমিও আপনার সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পাইনি।'

চেয়ে দেখলাম। বেডিং বাঁধা-অবস্থায় পড়ে আছে। ট্রাঙ্ক, স্যুটকেশ অনাদরে ছড়িয়ে আছে এদিকে ওদিকে। খানকতক শাড়ি জামা তোয়ালে একপাশে পড়ে আছে। এই সব গুছিয়ে তুলতে হবে, তবে আমার ছুটি।

শীলা মিত্র বোধহয় আমার বিপন্ন অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, 'চা টা খেয়ে নিন, তারপরে আমরা দু'জনে হাতে হাতে এ সব গুছিয়ে ফেলব।'

'আচ্ছা', একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বললাম, 'কিন্তু আপনাকে ট্রাবল্ দিতে ভারি খারাপ লাগছে।'

হেসে বললেন শীলা মিত্র, 'দেখুন, আমরা দু'জনে একই ঘরে থাকব। এ সব ফর্ম্যালিটি করলে দু'জনেরই অসুবিধে হবে। আমার দরকারে আপনি আসবেন; আবার আপনার দরকারে আমি। চলুন, চা খেয়ে আসা যাক। তারপরে কোমর বেঁধে কাজে লাগা যাবে।'

তাঁর ক্ষীণ কটিদেশের দিকে তাকিয়ে কিন্তু শঙ্কিত হলাম। ভদ্রমহিলা চিররুগ্না। থরে থরে সাজানো শিশি-বোতলেই তার প্রমাণ। ওঁকে সাহায্য করতে বলতে কেমন বাধ'-বাধ' ঠেকে। বোধহয় তিনি অনুমান করলেন আমার মনের কথা। আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'আমাকে দেখে যতটা দুর্বল মনে করছেন, আমি ঠিক ততটা ডেলিকেট নই। তবে কি জানেন, বহুদিন লিভার-ট্রাবলে

ভুগছি। একটু হার্টের দোষও আছে। তারপর কিছুদিন হলো। শুরু হয়েছে অম্বল, ভীষণ অম্বল। যা খাই, তার কিছুই হজম হয় না, গলা বুক জ্বলতে থাকে।' বলেই উদ্গার তোলার উপক্রম করলেন। সেটা সামলে নিয়ে বললেন, 'আপনার কোনো ভয় নেই, সব ঠিক করে দিচ্ছি।'

তাঁর ব্যবহারে খুশি হলাম।

বিকেলের ফাঁকে ফাঁকে খাবার টেবিলে আলাপ জমে উঠল আব সকলের সঙ্গে। হোস্টেলের পবিবাবে আমাকে নিয়ে এগারজন।

একজন হেসে বললেন, 'একাদশ বৃহস্পতি!'

প্রথমদিনের অল্প আলাপেব অবকাশে কেউ কাছে টেনে নিলেন নিবিড়ভাবে, কেউবা ভদ্রতাকে বাঁচিয়ে বাখলেন স্বল্প হাসির বেড়া দিয়ে।

আলতোভাবে একজন প্রশ্ন করলেন, 'কেমন লাগছে আপনাব?'

জবাব নিষ্প্রয়োজন; তবু বললাম, 'বেশ তো!'

একটি নিঃস্পৃহকণ্ঠ থেকে উত্তব এল, 'বেশ লাগাই তো উচিত। আমাদেবও ঐরকম লেগেছিল।'

চোখ তুলে তাকালাম। তিনি ততক্ষণে মুখ টিপে হেসে অসীম মনোযোগেব সঙ্গে ঝোলের বাটি টেনে নিয়েছেন। বাকি সময়টুকু নীরবে কাটল।

রাত্রি বেড়ে চলেছে। ঘুম আসছে না। নতুন জায়গা, অনভ্যস্ত পরিবেশ। তাকিয়ে আছি মাথার কাছে খোলা জানলাব ফাঁকে কালো আকাশেব দিকে। সীমার মাঝে নিজেকে আবদ্ধ রেখে অসীমের দিকে তাকানোর মধ্যে রোমান্স আছে, সন্দেহ নেই। শীতের কুহেলীভরা রাত্রি। দূরে একটা কুকুর বোধহয় শীতাধিক্যের জন্যই আর্তস্বরে ডেকে ওঠে, কেঁদে ওঠে ওপরের ভাড়াটেদের নবজাত শিশু। একটি সাইকেল ক্রিং ক্রিং করে চলে যায় রাস্তা দিয়ে।

গভীর নিদ্রায় অচেতন শীলা মিত্র। সারা হোস্টেল নিঝুম।

ক্লোরোফর্মের মৃদুগন্ধে আচ্ছন্ন রোগীর মতো আমার চোখেও কখন ঘুম নেমে এসেছিল জানতে পারিনি।

স্কুলের গোড়া পত্তনের আদি কাহিনী রূপকথার রসে ডুবিয়ে বর্ণনা করতেন আমাদের বুইদিদি। বুইদিদি মানে শ্রীমতী কাত্যায়নী বোস—এই স্কুলের প্রথম শিক্ষয়িত্রী। তিনি যখন এই স্কুলে ঢোকেন তখন আমাদের মধ্যে অনেকেই মার কোলে শুয়ে অবোধ্য ভাষায় কথা কইতাম আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেয়ালা করতাম। কি ভাবে কাত্যায়নী বোস বুইদিদিতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, তা' নিয়ে কেউ গবেষণা করে না। তবে শোনা যায়, মা-বাবা আদর করে ডাকতেন 'বুড়ি' বলে। বোধকরি সেই নামেরই অপভ্রংশ 'বুই'; অতঃপর যুক্ত হয়েছে দিদি।

শিক্ষয়িত্রীদের কাছে তিনি বুইদিদি, ছাত্রীরা ডাকে বুইদিদি, এক ডাকে বুইদিদিকে চেনে পাড়ার ছেলে বুড়ো সবাই। বয়স ষাটের দিকে। পাঁচ ফিটের ওপর লম্বা, উত্তম শ্যামবর্ণ, মাথার সামনের দিকে অনেকখানি চুল উঠে গিয়েছে; শূন্য স্থান পূরণ হয়েছে চওড়া করে সিঁদুর লেপনে; একটু সামনের দিকে ঠেলে-আসা কপালে একটা বড় সিঁদুর টিপ—ক্লান্তির ঘাম মিশে লক্ষ্মী পূজোর তেল-সিঁদুরের কথা মনে করিয়ে দেয়। হাতে দুটি মোটা শাঁখা, তার পাশে সামান্য সোনা মাঝে মাঝে ঝিকমিক করে ওঠে। বাঁ হাতে একগাছি লোহা—এয়োতির লক্ষণ।

বুইদিদির স্বামী ডাক্তারি পাস করে রেঙ্গুনে চাকরি পান। বড় চাকুরের ঘরণী-গৃহিণী হবেন ভেবে সেদিন পনের বছরের মেয়ে বুইদিদি উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন। অজানা-অচেনা দেশ, তাই প্রথমবার একা গেলেও পরের বারে এসে স্বামী নিয়ে যাবেন, এই আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠলেন বুইদিদি। স্বামী-অদর্শনে চোখের জলে বালিশ ভিজে যেতো। বুইদিদি তাকিয়ে থাকতেন নীল

আকাশের পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের দিকে, ঠিক যেন সমুদ্রের ঢেউ ; আছড়ে পড়ছে সুদূর রেঙ্গুনের তটভূমিতে।

ফিরে এলেন স্বামী। আবার চলে গেলেন। এবারেও একা। একটু না গুছিয়ে নিতে পারলে বুইদিদিরই অসুবিধে হবে।

তারপর অনেকদিন কেটে গেল। 'তানাখা'-লিপ্ত মুখের সৌরভে মুগ্ধ হলেন ডাক্তার বোস। প্রজাপতির ডানার ক্ষেপণে লাল শাড়ির আঁচল কোথায় মিলিয়ে গেল! ডাক্তার বোস রেঙ্গুনেই ঘর বাঁধলেন—ঘরণী হলো ওদেশেরই মেয়ে।

'জুনিয়ার ট্রেনিং পাস করে যখন স্কুলে ঢুকলাম, তখন কোথায় ছিল এই লাল দোতলা বাড়ি, এত বড় খেলার মাঠ, ফুলবাগান, আর এত মেয়ে! ঐ যেখানটায় এখন মেয়েদের টিফিনের শেড হয়েছে, সেখানটায় ছিল স্কুল। পড়ানো হতো ক্লাশ ফোর অবধি। ওপরে টালি ছাওয়া ; একটি করে ইট গাঁথা দেয়াল-ঘেরা একখানা বড় ঘরকে টিনের পার্টিশান করে চারটে ক্লাশ বসতো।

'চারুসুন্দরী দেবী তখনও বেঁচে। জমিদার বাড়ির ঠাকুর-দালানে যখন মা দুর্গার পুজো হতো তখন প্রতিমা দেখবো, না তাঁকে দেখবো—ঠিক করতে পারতাম না—এমনি ছিল তাঁর ভগবতীর মতো রূপ। দয়া-দাক্ষিণ্যে তেমনি ছিলেন অন্নপূর্ণা। পদ্মকলি হাত উপুড় করেই রাখতেন। সতী-লক্ষ্মীর মৃত্যু হলো স্বামীর কোলে মাথা রেখে। অনেক খরচ করে জমিদার স্ত্রীর নামে স্কুল বাড়িটি তৈরি করে দিলেন। স্ত্রীকে হারিয়ে জমিদার যে-ক'টি বছর বেঁচে ছিলেন, কেবল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন এই বাড়িটিকে।'

আমরা অবাক হয়ে শুনতাম বুইদিদির কথা।

'ভর-দুপুরে শিয়াল ডাকতো স্কুলের পিছনে পুকুরপারে। সেই পুকুর বুঁজিয়ে এখন হয়েছে খেলার মাঠ। জমিদারের মৃত্যুর পর নতুন করে কমিটী হলো। কত প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী, হেড-মিস্ট্রেস এলেন। চেয়ার ঠিক থাকলেও লোক পালটালো কতবার!

'সেবার হেডমিস্ট্রেস হয়ে এলেন ইভ্‌লিন মৃণালিনী বোস। লোকে বলতো, মেম সায়েব। টকটকে রং, টুকটুকে মুখ। বছর ছাব্বিশ বয়েস। রোববার সকালবেলা নস্যি-রঙের সিল্কের ছাতাটি

মাথায় দিয়ে যখন রাস্তা দিয়ে সিধে হেঁটে কাজীপাড়ায় মিশনারীদের গির্জেয় যেতেন, তখন হাঁ করে চেয়ে দেখতো সবাই। মিস্ বোস ছিলেন পয়মন্ত লক্ষ্মী। তাঁর স্পর্শে স্কুল যেন কেঁপে উঠল। শ্রী-শৃঙ্খলা এল, ছাত্রী বাড়লো, এইট পর্যন্ত ক্লাশ খোলা হলো। ফুল গাছ লাগাবার জন্য মাটি খুঁড়তে লাগলেন তিনি নিজে। সমস্ত স্কুলটার সে কী জলুস!

'কিন্তু তারপর কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল! একদিন সকালবেলা দেখা গেল, মিস্ বোস উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকিয়ে আছেন। মাথার চুল ফুলে ফেঁপে উঠেছে, মুখে কেবল ইংরিজী বকুনি। ডাক্তার বদ্যি এল, টেলিগ্রাম পেয়ে একমাত্র আপনজন ছোট ভাইটি ছুটে এল। কিন্তু কাউকে তিনি চিনতে পারলেন না।

'পাড়ার লোকেরা বললো, কোনো অপদেবতা ভর করেছে। সন্ধ্যের সময় পায়ে-চলা সরু জঙ্গুলে রাস্তা দিয়ে প্রায়ই তিনি যেতেন মিশনারী ক্যাব্‌ট্রি সায়েবের 'সুসমাচার' প্রচারের ক্লাশে। অর্গ্যানের শব্দ ভেসে যেতো অনেক দূর। বুড়ো বেলগাছের তলা দিয়ে যেতে আমি তাঁকে কতদিন বারণ করেছি, মিষ্টি হেসে চলে গিয়েছেন, কথা শোনেননি।

'খবর পেয়ে ক্যাব্‌ট্রি সায়েব এলেন। এই লম্বা চেহারা, সাদা আলখাল্লা পরা, কোমরে কালো রঙের চওড়া বেল্ট্, বুকে দুলছে একটা বড় ঝক্‌ঝকে ক্রশ। সায়েবের বয়েস বেশি নয়। মুখখানা কী যে সুন্দর! মনে হলো বুঝি বাইবেলের দেবদূত নেমে এসেছেন!

'মিস্ বোসের দিকে চেয়ে চেয়ে সায়েবের চোখ দুটি ছল্‌ছলিয়ে উঠল। স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে ক্যাব্‌ট্রি সায়েব মিস্ বোসকে কোথাকার এক হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

'যাওয়ার দিনটা আজও আমার মনে পড়ে। স্কুল বন্ধ। ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে মিস্ বোসের কোয়ার্টারের দরজায়। জিনিসপত্তর উঠে গেলে যতটা সম্ভব কাপড়চোপড় গুছিয়ে মিস্ বোসকে গাড়িতে তুলে দিলাম।

'কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন মিস্ বোস। পাশে

বসলো ছোটভাইটি। গাড়ি ছেড়ে দিলো। তাঁর যাওয়ার সময় একটা বড় রকমের ভিড় জমে উঠেছিল। কারও চোখ শুকনো ছিল না। মৃণালিনী বোসের সম্পর্ক ছিল সকলের সঙ্গে।

'ক্যাবট্রি সায়েবকে কিন্তু দেখলাম না। গাড়িটি যতক্ষণ দেখা গেল, দাঁড়িয়ে ছিলাম। গির্জের চূড়োটা শিমূল গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল। পাশেই চ্যাপলেনের বাড়ি। হঠাৎ চোখে পড়ল, একটা গরাদ-হীন জানলায় দাঁড়িয়ে দীর্ঘ এক সাদা পাথরের মূর্তি।'

ছোট্ট একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বুইদি বললেন, 'ক্যাব্ট্রি সায়েবও আর বেশিদিন রইলেন না, ব্যাণ্ডেল না কেষ্টনগর, কোথায় যেন চলে গেলেন।'

'তারপর ?'

'তারপর আর নেই। এ গল্পের এখানেই শেষ।'

বুইদি টিচার্স কোয়ার্টার্সে থাকতেন না, স্কুলের কাছেই একটা বড় বাড়ির একখানা মাত্র ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। প্রতিদিন বুইদি অণ্টু, মণ্টু, রুণু, শঙ্করী, ঝুমঝুমি আর বাঁশী এই ক'টিকে নিয়ে দুধ ভাত খাওয়াতে বসতেন। কোনো কোনো দিন দুধের বদলে মাছ ভাজা ; নিজের হাতে কাঁটা বেছে দিতেন। বদলে বদলে না দিলে মুখে রুচবে কেন ? ছ'টি জায়গায় ছ'টি ভাগে ভাত দিয়ে বুইদি অণ্টু মণ্টুদের খাওয়া দেখতেন।

কেউ শুভ্র, কেউবা ঈষৎ কালো, তৈল-চিক্কণ নধরকান্তি, চারুপদক্ষেপে সারা বাড়িতে ঘুরে বেড়াতো ছ'টি মার্জার মার্জারী। এই মূক প্রাণী ক'টিকে কোলের কাছে টেনে সন্তানহীনা বুইদিদি তাঁর বাৎসল্য রস উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলেন। মাসের শেষে যা পেতেন, তাতে বুইদিদির একার চলে যেতো বেশ স্বচ্ছন্দে। কিন্তু আর ছ'টিকে তো খাইয়ে দাইয়ে বড় করে তুলতে হবে। তাই স্কুলের পরিশ্রমের ওপরেও তাঁকে সকাল-সন্ধ্যায় দুটি ট্যুইশনির শ্রম স্বীকার করতে হয়েছে।

রুণু শঙ্করীর বিবেচনা বুদ্ধি বড় কম ; তাই বছরে অন্তুতঃ দু'বার করে বুইদিদি দুর্ভাবনায় পড়তেন—কি করে ওদের নির্বিঘ্নে প্রসব

হবে। মুখের রুচি ফেরাবার জন্য মাঝে মাঝে অন্যের হাঁড়ির স্বাদ গ্রহণ করতো রুণু আর শঙ্করী। ফলে অনেক ঝাঁঝালো অভদ্র কথা শুনতে হয়েছে বুইদিদিকে। কিন্তু পাড়ার লোকের কথা শুনে কবে কোন্ মা-ই বা পেরেছেন তাঁর ছেলেমেয়েকে তাড়িয়ে দিতে ?

যখন তাঁর বিছানার ওপরে রুণু-শঙ্করী মাতৃত্ব লাভ করত, তখন নাক সিঁটকে চলে যেতো সবাই। বলতো, 'আদিখ্যেতা!'

সন্তানবতী কোনো গিন্নী হাতের চুড়ি বাজিয়ে মুচকি হেসে বলতেন, 'একখানা চিঠি লেখো না কর্তাকে। দুধের সাধ ঘোলে মিটিয়ে আর ক'দিন চলবে ?'

মুখ কালো করে বসে থাকতেন বুইদিদি। রিক্ততার গ্লানিতে মাথা নিচু হয়ে আসতো।

একদিন বললাম, 'এই বয়েসে কেন চাকরি করছেন ? ডাক্তার বোসের কাছ থেকে অন্তত: খোর-পোষটাও তো দাবী করতে পারেন!'

বুইদিদি হাসলেন। বললেন, 'তবে শোন্, সে এক মজার কথা। খবর পেলাম উনি এসেছেন কোলকাতায়। বাড়ি ভাড়া করে আছেন। বড় দেখতে ইচ্ছে করল। সেই তো কবে দেখেছি!

'নম্বর খুঁজে বাড়ি বার করলাম। কত বড় বাড়ি। ভাড়া অন্ততঃ দেড়শ' দু'শ' না হয়ে যায় না। তাকিয়ে দেখলাম, গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন তোদের ডাক্তারবাবু। চেহারা কত পালটে গিয়েছে। মাথার চুলগুলি সাদা হয়ে এসেছে, ঘাড়টি একটু ঝুঁকে গিয়েছে সামনের দিকে। আমাকে দেখেছিলেন কিনা জানি না; তবে ঘরের মধ্যে চলে গেলেন, এইটুকু মনে আছে। হয়তো চিনতে পারেননি। পনের বছর আর পঁয়তাল্লিশ বছরে তো অনেক তফাত! বাড়ি ঢুকতে কেমন ভয় করল। ফিরে এলাম।'

অনেকদিন কেটে গিয়েছে। একটা মাসিকপত্রের পাতা উলটে যাচ্ছিলাম। একটা গ্রুপ ফটো চোখে পড়লো; নববর্ষ উপলক্ষ্যে

রেঙ্গুনের প্রবাসী বাঙালীদের সারস্বত সম্মেলনের আলোকচিত্র। রেঙ্গুনের খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাক্তার মোহিত বোসের ভবনে এই সম্মেলনের অধিবেশন হয়েছিল।

ফটোটিতে কয়েকজন গণ্যমান্য অতিথির সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং বাড়ির মালিক আর তাঁর পুত্র সনৎ বোস—এই সম্মেলনের সম্পাদক।

বুকের রক্ত তোলপাড় করে উঠল। সবাইকে আড়াল করে ছবিটি দেখালাম বুইদিদিকে। কাছে টেনে নিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলেন ছবিটি। দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো সুন্দর সুঠাম যুবক সনৎ বোসের ওপর।

'ঠিক ওঁরই মতো দেখতে হয়েছে, অবিকল—'

চশমাটা খুলে নিয়ে বুইদিদি কাপড়ের আঁচল দিয়ে কাচ দুটো ঘসতে লাগলেন অনেকক্ষণ ধরে।

সাত পিরিয়ড ক্লাশের মধ্যে একটি করে 'অফ্'—ধু-ধু প্রান্তরে একমুঠো সবুজ ঘাস, অমিত্রাক্ষর ছন্দে ক্ষণেকের যতি। এই অবসর-মুহূর্তটুকু আমাদের ন্যায়ত পাওনা। কিন্তু এই মধুর প্রাপ্য কঠিন কর্তব্য হয়ে পড়ে, যখন কোনো শিক্ষয়িত্রী অনুপস্থিত থাকেন।

স্কুল বসবার দশমিনিটের মধ্যে হেডমিস্ট্রেস ধীর লঘু পদক্ষেপে রাউণ্ড দিয়ে আসেন সমস্ত স্কুলটা। বুইদি বলেন, 'ঠাকরুণ রোঁদে বেরিয়েছেন!'

বারান্দার দিকে পিছন ফিরে বসা শিক্ষয়িত্রী জানতেও পারেন না, তাঁদের হর্তাকর্তা কখন কি ভাবে এসে লক্ষ্য করে গিয়েছেন তাঁদের শিক্ষাদানের রীতি, ক্লাশে নিয়মবিরুদ্ধ সামান্যতম বিশৃঙ্খলা, অথবা কোনো শিক্ষয়িত্রীর হঠাৎ অনুপস্থিতির ফলে সেই ক্লাশের ছাত্রীদের ক্ষতিকর চাঞ্চল্য।

এরপর তিনি ফিরে আসেন তাঁর ঘরে, রুটিন দেখে ঠিক করে

দেন অনুপস্থিতের শূন্যস্থান পূরণ করবেন কোন্ কোন্ শিক্ষয়িত্রী। ভারবাহীর ভার নামাবার অবকাশ জোটে না মোটে ; আর এই অবসন্ন মন নিয়ে যখন ছাত্রীদের অঙ্ক কষাই বা কবিতা পড়াই, তখন তাতে না থাকে রস, না থাকে মাধুর্য। এর ওপর আছে হেড-মিস্ট্রেসের কড়াপাকের মৌখিক নোটিশ।

'মিস্ চক্রবর্তী, চিৎকার করে পড়ালেই যে মেয়েরা শান্তশিষ্ট হয়ে আপনার পড়ানো শুনবে, তার কিন্তু কোনো মানে নেই। আপনি ইন্টারেস্টিং করে পড়াতে পারলে জোরগলার কোনো প্রয়োজনই হবে না।' 'বীণা, ইংরিজী পড়াবার সময় প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের ইংরিজী আর বাংলা অর্থ বোর্ডে লিখে লিখে দেবে। মুখে বললে ওরা কিছুই শুনবে না।' 'সবাই দাঁড়িয়ে পড়াবেন, আপনাদের দৃষ্টি পেছনের মেয়েদের ওপরেও থাকা দরকার।' 'মিসেস চৌধুরী, আজ আপনার ক্লাশে কিন্তু লাস্ট বেঞ্চে দু'তিনটি মেয়ে নিজেদের মধ্যে গল্প করছিল। এগুলো লক্ষ্য রাখবেন।' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তারপরে আছে সিন্ধুদাসীর হাতে মোটা বাঁধানো খাতায় চলমান নোটিশ, "The teachers are hereby requested···"

বুইদি বলতেন, 'নাও গো, তোমাদের প্রেমপত্তর এল।'

প্রথম যখন এলাম তখন শৃঙ্খলা স্থাপন ও স্কুলটিকে আদর্শ করে গড়ে তোলার জন্য হেডমিস্ট্রেসের এই প্রাণপণ প্রয়াস একটু কঠিন মনে হলেও ভালো লাগতো। শ্রদ্ধা জাগতো। আদর্শের স্বপ্ন সেদিন আমার চোখেও ছিল। কিন্তু অভিজ্ঞ হয়েছি যত, হতাশ হয়েছি তত। তবু মানুষের মন আশাবাদী। তাই আশা ছাড়িনি আজও।

একদিকে দেখেছি শিক্ষয়িত্রীদের, অন্যদিকে ছাত্রীদের—এ দু'-এর মধ্যে সম্পর্ক কোথাও নিবিড়, কোথাও সাধারণ, কোনো ক্ষেত্রে স্বাভাবিক, কোথাও বিকৃত কুৎসিত। কখনও উল্লসিত হয়েছি, কখনও বা ব্যথা পেয়েছি।

পাঁচফুলের সাজি আমাদের স্কুল—বড়লোকের একচেটিয়া নয়। মেয়ে ভর্তি হবার সময় প্রয়োজন হয় না অভিভাবকের মাসিক

আয়ের পরিমাণ জানার, ইউনিফর্মের অযথা পীড়নে তিক্ত হয় না অভিভাবকের মন। এখানে মধ্যবিত্ত ও গরীবের মেয়ে আছে অনেক। বলতে গেলে তাদের দেওয়া মাইনেতেই স্কুলের আর্থিক সমস্যার একটা বড় অংশের সমাধান হয়।

পাঁচমিশেলি মেয়ের পাঁচ রকমের পরিচ্ছদ। প্রার্থনা লাইনে যখন একসঙ্গে দাঁড়ায়, তখন তাদের পোষাকের বৈচিত্র্য অভিভাবকদের আর্থিক তারতম্যকে প্রকট করে তোলে।

ক্লাশ টেনে পড়ে কৃষ্ণা সেন। স্থানীয় এক বিখ্যাত উকিলের কন্যা। দেখতে ভালো, পড়াশুনাতেও মন্দ নয়। সব চাইতে বড় গুণ, পিতা স্কুল কমিটীর প্রভাবশালী মেম্বার। কৃষ্ণা পরে আসে দামী ধনেখালি অথবা সুন্দর ছাপানো শাড়ি, নতুন ডিজাইনের ব্লাউজ, হাতে গলায় কানে আর অনামিকায় সোনার অলঙ্কার। নতুন শাড়ির খস্‌খসানিতে, হাতের চুড়ির রিনিঝিনি শব্দে আকৃষ্ট হয় অন্য মেয়ের দৃষ্টি। চাপা নিঃশ্বাস মিলিয়ে যায় বাইরের হাওয়ায়। কৃষ্ণা হেডমিস্ট্রেসের প্রিয় ছাত্রী, তাই স্কুলে পোষাকের চটক বা অলঙ্কারের বাহুল্য দেখানোর নিয়ম না থাকলেও কৃষ্ণার বেলায় ব্যতিক্রম। কোন কোন মেয়ে পরে সালোয়ার পাঞ্জাবি—বোধহয় পরিবারের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। কিন্তু ব্যথা পাই, যখন দেখি, সেই অনুকরণে কোনো মেয়ে পায়জামা পরলেও ওপরে পরেছে ফ্রক। সবকিছু যোগাড় করতে না পারলেও ইচ্ছাকে সে দমন করতে পারেনি।

কৃষ্ণাকে অনুকরণ করতে গিয়ে নিজের বাড়ির মা-বৌদির সঙ্গে মনোমালিন্য হয়েছে অনেক লীলা বেলা লতিকার। অণিমা কেরাণী বাপের মেয়ে। দৈনন্দিন জীবনে মিলের মোটা শাড়ির ওপর সে উঠতে পারে না। তাই আঁচ বাঁচিয়ে চলে কৃষ্ণার মতো মেয়েদের। অবচেতন মনে জেগে ওঠে সূক্ষ্ম ঈর্ষা ; সেইটেই প্রকাশ পায় একই ক্লাশে কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে পরস্পরের সমালোচনায়।

এই বৈষম্য দূর করার জন্যই দু'একটি নামকরা স্কুলে ছাত্রীদের ওপর কড়া আদেশ আছে—তাদের একরকম পাড়বিশিষ্ট সাদা শাড়ি আর সাদা ব্লাউজ পরতে হয়। অথচ আশ্চর্য ও হাস্যকর এই যে, গরীবের মেয়ে দূরের কথা, সাধারণ মধ্যবিত্ত অভিভাবক

পর্যন্ত সাহস পান না তাঁর মেয়েকে ঐ নামজাদা স্কুলে ভর্তি করাতে। ঐ সব স্কুলে প্রায় সকল ছাত্রীরই আর্থিক ক্ষমতায় সাম্য আছে; তাই বৈষম্য নেই তাদের বেশবাসে।

প্রকৃত শিক্ষা তো শুধু পুঁথির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না; তাই সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা হয় না কোনো শিক্ষালয়ে। শিক্ষাদানের বৃহৎ-কলেবর পরিকল্পনা খানিকটা কার্যকরী হয় মহানগরীর মাত্র কয়েকটি বড় স্কুলে। তারা সরকারী গ্র্যান্ট্ পায় প্রচুর, তাদের ছাত্রী সংখ্যা সীমাবদ্ধ। ছাত্রীরা বেশির ভাগ সেই সব পরিবারের যাঁরা সমাজের ম্যাগনেট। বাড়ির গাড়িতে করে এই সব স্কুলে পড়তে আসে জাস্টিস চৌধুরী, কিংবা স্যর কাঞ্জিলাল অথবা অমুক কোম্পানীর বারআনির অংশীদার অমুক ঝুনঝুনওয়ালার মেয়ে। আর আমাদের সাধারণ স্কুলে কি হয়? সেখানে হয় বৈচিত্র্যহীন এগারটা-চারটে। দলে দলে মেয়ে আসে, সীমা নেই, সংখ্যা নেই।

আমাদের স্কুলটি ব্যতিক্রম হলেও অধিকাংশ স্কুলে আলো-বাতাসহীন অন্ধকূপে কয়েকঘণ্টার জন্য বন্দী করে রাখা হয় প্রাণচঞ্চল ছেলেমেয়েদের। দেহে মনে যখন তারা স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে বেড়ে উঠতে চায়, তখনই তাদের দাবিয়ে রাখা হয় মুখের ও পুঁথির নীতিশাসনে। মহীরুহ তারা হয় না; তারা হয় জাপানী টবের বামন-বট। তারা তোতা পাখীর মতো পড়া মুখস্ত বলে, আর দিদিমণির মলিন ক্লিষ্ট মুখ দেখে বদ্ধঘরে হাঁপিয়ে ওঠে।

যে স্কুলের অবস্থা ভালো, তার নিজস্ব 'বাস' আছে। অবশ্য সেকালের ঘোড়ায় টানা খড়খড়ি বন্ধ নয় বা তার গায়ে লেখা নেই, "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।" তখন উদ্দেশ্য ছিল স্ত্রী-শিক্ষার সার্বজনীন প্রসার, আর এখন হয়েছে প্রতিষ্ঠানগত প্রচার। তাই আজকের দিনে বাসের গায়ে লেখা থাকে অমুক উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন মেয়েরা তাতেই দু'তিন ট্রিপে বাড়ি-স্কুল করে। বাদবাকি মেয়েরা আসে পায়ে হেঁটে। তার মধ্যে একটি দল চলে স্কুলের ঝিয়ের হেপাজতে। মেয়ে নিয়ে রাস্তায় পা দিলে সামান্যা ঝি হয় তখন ঝাঁসীবাহিনীর অধিনায়িকা অনারেব্‌ল জি-ও-সি।

যাওয়া-আসার পথে চোখে পড়ে রোয়াক-পালিশ-করা মা সরস্বতীর ছায়া বাঁচানো লপেটি তরুণের দল। মেয়েদের যেতে দেখে ছুঁড়ে দেয় অনাবশ্যক হাসির ছর্‌রা, আর বম্বে ফিল্মের চটুল রংদার গান। জি-ও-সি কিন্তু অত সহজে ছেড়ে দেয় না। মুখ ঝাম্‌টিয়ে পথের নায়কদের গানের প্রত্যুত্তর দেয়—'মুয়ে আগুন!' মেয়েদের সামনে ঠেলে নিয়ে চলে যায় স্কুলের ঝি।

ছাত্রী-শিক্ষিকার সম্পর্ক কি রকম হওয়া উচিত, তা নিয়ে আলোচনা হয় বিস্তর। প্রাচীনকালে গুরুগৃহে ছাত্রেরা সমবেত হতো। পিতৃজ্ঞানে তারা গুরুমহাশয়ের পায়ে শ্রদ্ধানিবেদন করত, পাঠান্তে গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে যে যার বাড়ি ফিরে আসতো। অতি স্বাভাবিক গতিতে এই নিয়ম চলে আসছিল, ব্যতিক্রম হলো পরে।

আমার ছাত্রীজীবনে দেখেছি, শিক্ষয়িত্রী-ছাত্রী সম্পর্কে কত জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা সকলেই শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর সমান প্রিয় হবে, এ চিন্তা বাতুলতা মাত্র। স্বয়ং দ্রোণও পারেননি এ ক্ষেত্রে সমদৃষ্টির পরিচয় দিতে। যে-মেয়েরা লেখাপড়ায় ভালো, উৎকর্ষের পরিচয় দেয় খেলায় ও অভিনয়ে—তারা অতি সহজে শিক্ষয়িত্রীদের সান্নিধ্য পায়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, অবশিষ্টেরা দূরে সরে যাবে, তারা অবজ্ঞেয় হবে, তারা হবে উপেক্ষিত। এই রকম হয় বলেই পিছনে যারা বসে থাকে, তারা চিরকাল পিছনেই থাকে। তাদের সম্বন্ধে শিক্ষয়িত্রীদের মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা গড়ে ওঠে এবং এই ধারণাটা বরাবরই বজায় থাকে—পরীক্ষার খাতা দেখার সময়েও।

যে-সব ছাত্রী শিক্ষয়িত্রীদের প্রিয়পাত্রী হয়, তাদের তখন বয়ঃসন্ধি। সোনালি মায়া মাখানো চোখে থাকে কিশোরীর স্বপ্ন। অজানা পুলক সঞ্চারিত হয় দেহে মনে। তাই সে তার প্রশংসা শ্রদ্ধা প্রীতির ঝুলি নিঃশেষ করে দেয় শিক্ষয়িত্রীর পায়ে। শুষ্কপ্রাণ শিক্ষয়িত্রী ভুল করেন এখানে; কিশোরী ছাত্রীর এই অন্ধ আকর্ষণকে অনেক সময় তিনি বাধা দেন না, বরং পরোক্ষভাবে

দেন সম্মতি। মেয়েদের বয়ঃসন্ধিতে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে বজায় রাখতে হয় অতি সাবধানে। নইলে ক্ষতি করে অনেক কচিকিশলয়ের।

এই ক'বছরের মধ্যে কত মেয়েকে দেখেছি। দেখেছি কত বালিকা ধীরে ধীরে কিশোরীতে পরিণত হয়েছে ; একদিন সহসা তার চাঞ্চল্য গিয়েছে থমকে ; ক্ষণে ক্ষণে উচ্চস্বরে কথা বলা, আকণ্ঠ হেসে ওঠা, দ্রুতবেগে ছুটে যাওয়া, সহপাঠিনীর সঙ্গে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে পৃথিবী তোলপাড় করা—সবই যেন মন্ত্র-শান্ত ভুজঙ্গের মতো থেমে গিয়েছে। তাদের চরণ হয়েছে কুণ্ঠিত, বেশবাস সুবিন্যস্ত,—অশোভন উচ্চহাসি আর শোনা যায় না। কোমল চোখ দুটি হয়েছে ঘনপল্লব ভারে আনত ; দুই গণ্ডে দেখা দিয়েছে দু'চারটি ব্রণ। ছোটদের এ্যাডভেঞ্চারের বই অনাদরে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তার স্থান নিয়েছে বৌদি-দিদির উপহার-পাওয়া দুটি একটি উপন্যাস ; নিষিদ্ধ বস্তুর মতো ক্লাশের মধ্যে গোপনে হাতে হাতে ফেরে।

মাঝে মাঝে মণিকাদির রূঢ় কণ্ঠ শুনি, 'যদি কারো কাছে ফের কোনো নাটক-নভেল দেখি—'। ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে সে হুঁঙ্কার।

বারান্দা থেকে কতদিন চেয়ে দেখেছি, দু-চারটি মেয়ে টিফিনের সময় লিচু গাছটার আড়ালে বসে গল্প করছে অনেকক্ষণ ধরে। মাঝে মাঝে চকিত-ভীরু দৃষ্টিপাত করছে হেডমিস্ট্রেসের ঘরের দিকে—যেন কত অপরাধী।

ক্লাশে পড়াতে গিয়ে কোনো একটি মেয়েকে ক্রমান্বয়ে অনুপস্থিত হতে দেখে অন্য মেয়েকে প্রশ্ন করেছি। সে ফিক্ করে হেসে বলেছে, 'সুমিত্রার যে বিয়ে হয়ে গিয়েছে পরশুদিন।'

তারপর প্রায় পক্ষকাল পরে নববিবাহিতা ছাত্রীটি এসেছে। ঝক্ঝকে গয়না মোড়া, মৃদু সুরভিত খড়কে ডুরে শাড়ি ঘেরা ক্ষীণ তনুটি, নবলব্ধ উল্লাসে রোমাঞ্চিত দেহ মন, প্রাপ্তির প্রাচুর্যে অলস চোখ দুটি আধ-নিমীল'। ধীরে ধীরে প্রণাম করেছে পায়ে হাত দিয়ে। আশীর্বাদ করেছি মনে মনে—কি আশীর্বাদ, জানি না।

মণিকাদি আগুন-রাঙা সিঁথিটির দিকে একটু তাকিয়ে ব্যঙ্গের

ঝাঁঝ মিশিয়ে বলেছেন, 'বই-টইগুলো যেন শিকেয় তুলে রেখো না, প্রাইভেট ম্যাট্রিকটা দেবার চেষ্টা করো।'

চলে গেলে বলেছেন, 'বউ-বউ ভাবটা কেমন ম্যানেজ করে নিয়েছে দেখো! চোখ দুটো একেবারে ঢুলুঢুলু!'

আর একজন একটু চিবিয়ে চিবিয়ে তিক্তস্বরে বলেছেন, 'একেবারে 'সখী ধর-ধর' ভাব!'—হঠাৎ থেমে গিয়েছেন তিনি।

ঈর্ষা, ব্যঙ্গ, না মরু-ধূসর জীবনের আতপ্ত কান্না?

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস—
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো, ধরায় আস।

কান পেতে শুনছি দালানের উত্তর কোণে ছোট্ট একটি খুপরি ঘর থেকে ভেসে আসা কবিগুরুর গান,—'সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো, ধরায় আস…' সুনয়নীদি গান করছেন, প্রতিদিন করেন। ভোরের আলো যখন ছড়িয়ে পড়ে আকাশের গায়, ব্যস্ততার স্পন্দন জাগে না শহরতলীর বুকে, সুনয়নীদি তখন গান করেন।

সে যে মনের মানুষ, কেন তারে বসিয়ে রাখিস নয়ন-দ্বারে
ডাকনা রে তোর বুকের ভিতর, নয়ন ভাসুক নয়ন-ধারে

কত দিন উঠে এসেছি, চুপি চুপি এসে দাঁড়িয়েছি সুনয়নীদির ছোট জানলাটিতে। দেখেছি তাঁকে, স্নান করা হয়ে গিয়েছে, চোখ বুজে বসে আছেন দুগ্ধ-শুভ্র শয্যাটিতে। সুরের মীড়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে চোখের দুটি পাতা। বড় বড় কয়েকটি জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়েছে দু'গালে। চোখ খুলে আমাকে দেখতে পেয়ে বলেছেন, 'ওখানে দাঁড়িয়ে কেন রে? চোখমুখ ধোওয়া হয়নি বুঝি এখনো?'

আমি সরে আসি। জানি এখনই সুনয়নীদি বসবেন তাঁর স্কুলের কাজ আর খাতার বোঝা নিয়ে। প্রথমে সেদিনের ক্লাশের পাঠ্যবিষয় নিজে পড়ে নেবেন, তারপর খুঁটিয়ে দেখবেন ছাত্রীদের প্রতিটি খাতা—সংশোধন করে নিজের হাতে লিখে দেখিয়ে দেবেন আরও ভালো লেখা কি করে লিখতে হয়।

সুনয়নীদি নিখুঁতভাবে সম্পাদন করতেন স্কুলের প্রতিটি কাজ। কোনদিন এক মিনিটও দেরি হয়নি স্কুলে যেতে বা ক্লাশে ঢুকতে। পরীক্ষার খাতার সংখ্যা দেখে কোনদিন কোন অভিযোগ তিনি করেননি বা স্কুল-সংক্রান্ত নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটেনি সুনয়নীদির কর্তব্যের রুটিনে। মণিকাদি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতেন, 'মানুষটিকে দেখো, তাঁর ঘরখানাকে দেখো, তাঁর কাজগুলিকে দেখো,—দেখো আর শেখো।'

এক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়ে সুনয়নীদি—সুনয়নী দেব। ঠাকুরদাদা ছিলেন শিক্ষক, বাবাও ছিলেন তাই; বড় ভাই অধ্যাপক, বড় বোন বাংলার বাইরের একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। শিক্ষাজীবনের সজীব প্রতীক ছিলেন আমাদের সুনয়নীদি। সকলের কাছে হেয় আর অবজ্ঞেয় এই শিক্ষয়িত্রীর জীবিকা। কিন্তু সুনয়নীদির অসীম শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস ছিল এই জীবনে। বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান শিক্ষার বিকাশ আর ক্রম-গতির ইতিহাস, তার রকমারি পরিবর্তন কণ্ঠস্থ ছিল সুনয়নীদির।

ওগো নব প্রভাত জ্যোতি ওগো চিরদিনের গতি
নূতন আশার লহ নমস্কার।

সুনয়নীদির মৃদু কণ্ঠে সুর খেলে যায়।

'তোরা ইতিহাস পড়েছিস, রাজারাণীদের নাম মুখস্থ করেছিস, মনে মনে তারিখ মিলিয়েছিস। কিন্তু চন্দ্রাবতীর নাম জানিস, মৈমনসিংহের চন্দ্রাবতী? যিনি একটা পুরো রামায়ণ রচনা করেছিলেন? আর বর্ধমানের হটী বিদ্যালঙ্কার? হ্যাঁ রে, একটি মেয়ে। কাব্যস্মৃতি আর ন্যায়শাস্ত্র শিখে নিয়ে কাশীতে টোল খুলে ছাত্রদের পড়াতেন, আবার অন্য ভট্চাজদের মতো 'বিদায়'ও নিতেন……।'

জীবন রথের হে সারথী,　　আমি নিত্য পথের পথী
পথে চলার লহ নমস্কার।
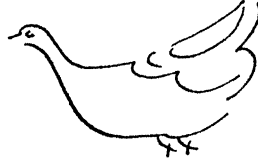
স্কুল আর কোয়ার্টার্স—একই পথে নিত্য আনাগোনা—একই কথার পুনরাবৃত্তি। কিন্তু এই তীর্থে জীবনটা তো মন্দ কাটেনি! অলস মুহূর্তে অতীতের স্মৃতি রোমন্থনে কত ছায়ামিছিল মূর্ত হয়ে ওঠে! চিনতে কষ্ট হয় না সিয়োন বিশ্বাসকে।

মিশ্‌কালো গায়ের রং, মুখশ্রী চলনসই, বুকচাপা একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা। ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ দুটি চোখে সদা-সর্বদা ধিকি ধিকি ফুটে বেরোয়। নাম তার আগে ছিল সিয়োন মণ্ডল, পরে হয় বিশ্বাস।

মা-বাবাকে মনে পড়ে না। শুধু মনে আছে সিস্টার বার্জকে। বাংলা দেশের কোন এক খ্রীষ্টান মিশনের অনাথ ছেলেমেয়েদের তিনি ছিলেন তত্ত্বাবধায়িকা। আপাদলম্বিত সাদা পোষাক, কৃষ্ণবর্ণের মস্তক-আচ্ছাদন, তার মধ্যে শঙ্খ-শুভ্র মুখ। সিস্টার বার্জের এই চেহারা এখনও নিত্য আনাগোনা করে সিয়োন মণ্ডলের মনের অলিগলিতে।

জর্ডন নদীর জল ছিটিয়ে সিয়োন মণ্ডলকে করা হয়েছিল শুচিস্নাত। ঈশ্বরের পুত্র ত্রাণ করেছিলেন মরজগতের আর একটি পাপীকে। সিয়োনের কানে এখনও ভেসে আসে সে দিনের প্রার্থনা সঙ্গীত :

গৌরব গৌরব দূতগণে গায়
গৌরব গৌরব ঝংকারে বীণায়,
মুক্তিপ্রাপ্ত যত সাধু সম্প্রদায়
মহানন্দে একতানে গায়।

কিংবা ক্রীস্‌মাসের প্রথম দিনে শেষরাত্রিতে একটি করে মোমবাতি জ্বালিয়ে সকলে মিলে মিশনবাড়ি প্রদক্ষিণ করা, তারপর পিয়ানোর সুরে সুর মিলিয়ে গান :

Hail thou ever blessed morn
Hail redemption happy dawn ;
Sing through all Jerusalem,
Christ is born in Bethlehem.

দৃঢ় নিয়মে কাঁটা চলতো মিশনের ঘড়িতে। সেখানকার আইন ছিল অলঙ্ঘ্য। কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে বড় হয়ে উঠলো সিয়োন। ম্যাট্রিক পাস করে সিনিয়ার ট্রেনিং নিলো, তারপর চাকরি হলো মিশনেরই স্কুলে। দিন কেটে যাচ্ছিল ছেলেমেয়ে পড়িয়ে আর প্রতি রোববার গির্জেয় গিয়ে পাঁচজনের সঙ্গে দেখা করে। নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা—এর চাইতে বেশি কিছু যে চাইবার অধিকার কোন মেয়ের থাকতে পারে, মিশনে পালিতা সিয়োনের সে ধারণা ছিল না। তবু একদিন ঘটনাটা ঘটে গেল—দৈবই বলতে হবে।

নতুন সেট্‌ল্‌মেণ্ট অফিস বসেছে শহরে। চার্চের খাসমহল জমির ট্যাক্স নিয়ে গোলমাল বাধায় তার অনুসন্ধান করতে সেট্‌ল্‌মেণ্ট্ অফিসে এলেন সিস্টার বার্জ—সঙ্গে ছিল সিয়োন। সেখানে সিয়োনের পরিচয় হলো সেট্‌ল্‌মেণ্ট ক্লার্ক পাঁচুগোপাল বিশ্বাসের সঙ্গে।

গ্রামের জাগ্রত ঠাকুর পঞ্চাননের দোরধরা ছেলে পাঁচুগোপাল, খাঁটি হিন্দুয়ানির শক্ত কোটিং তার দেহে মনে। তারও মাতৃপিতৃ-কুলে কেউ ছিল না। তাই বিয়ে হতে আটকালো না পাঁচুগোপাল বিশ্বাস আর সিয়োন মণ্ডলের।

বৃদ্ধা সিস্টার বার্জ আরক্ত মুখে, কম্পিত তর্জনী তুলে সিয়োনকে শুধু বাইরে যাওয়ার দরজাটি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এতদিন মিশনের অন্ন খেয়ে মেয়েটা কিনা শেষ পর্যন্ত বিয়ে করল হিন্দুদের একটা ছেলেকে! যারা মূর্তিপুজো করে, বর্বরের মতো কাঁসর ঘণ্টা বাজায়, আর মূর্খের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে কুম্ভমেলার গঙ্গায়। ওঃ হোলিগোস্ট! কী নেমকহারাম, কী অকৃতজ্ঞ……!

নরকে সিয়োন মণ্ডলের নিদারুণ পরিণাম কল্পনা করে সিস্টার বার্জ শিউরে ওঠেন। তাড়াতাড়ি কপাল, বুক আর দুই কাঁধ ছুঁয়ে 'ক্রশ' করে খানিকটা সান্ত্বনা পান।

পাঁচুগোপাল আর সিয়োন দুজনেই চলে এল কলকাতায়। সিয়োন চাকরি নিলো শহরতলীর চারুসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়ে। কাছেই ভাড়া করল একখানা ঘর আর তার সঙ্গে লাগোয়া একফালি বারান্দা। পাঁচুগোপাল হিসাব-নবিশীর কাজ পেলো এক মহাজনের দোকানে।

প্রথম দর্শনে সিয়োনকে আমার ভালো লাগেনি। আরও বিশ্রী লাগতো যখন দেখতাম কোন মেয়ের গলায় কানে নতুন গয়না দেখলেই কাছে টেনে নিয়ে বলতো, 'হ্যাঁরে মেয়ে, কতটুকু সোনা লেগেছে রে এতে? নতুন করলি বুঝি? মা দিয়েছে? কেন, তোর বিয়ে নাকি?'

লুব্ধ দৃষ্টি চক্‌চক্‌ করে উঠতো। ছাত্রীটি লজ্জা পেতো দিদিমণির কথা শুনে। কোন মেয়ের নতুন ডিজাইনের ব্লাউজ বা সুন্দর শাড়ি দেখলে তাই ধরে সিয়োন আকর্ষণ করতো সজোরে। কত দাম জিজ্ঞেস করে বলতো, 'তোর বাবাকে বলিস না কেন আমাকে একখানা এনে দিতে। দামটা না হয় পরে দিয়েই দেবো, বুঝলি!' অথবা, 'এই উলের জামাটা বুঝি তোর নতুন বৌদি' করে দিয়েছে? আমাকে একটা করে দিতে বলিস তো। একটু-আধটু না দিলে তোদের ভালো করে পড়াবো কেন?'

দাঁত বার করে নির্লজ্জের মতো হাসতো সিয়োন।

এমনি ধারা কত কথা মণিকাদির কানে উঠতো। আমরা মাথা নিচু করে থাকতাম লজ্জায় ঘৃণায়। রাগে মুখ ফিরিয়ে নিতাম সিয়োনকে দেখলে। একেই শিক্ষয়িত্রী সম্বন্ধে খুব ভালো ধারণা নেই আমাদের সমাজে, তার ওপর সিয়োনের এই ব্যবহার আমাদের দীনহীন করে চিত্রিত করতো অভিভাবকদের কাছে। অভাব, প্রয়োজন—সে তো প্রত্যেকেরই আছে। কিন্তু তার জন্য রিক্ততাকে এমন করে প্রকাশ করা!

কিন্তু আমাদের শত কটূক্তিতেও সিয়োন অতি আশ্চর্যভাবে উদাসীন থাকতে পারতো।

অনেক দিন কেটে গিয়েছে। হঠাৎ একদিন সকৌতুকে লক্ষ্য

করলাম—সিয়োনের বাঁ দিকের ওপর-হাতে কালো কারে বাঁধা একটি ছোট তামার মাতুলি।

'ওটা আবার কি! ওর মধ্যেও কি কোন নতুন ডিজাইন পেয়েছ নাকি, না কোন মেয়ের হাতে দেখে তার বাবার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছ?' একটু বাঁকা চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

সিয়োনকে এই প্রথম দেখলাম লজ্জা পেতে।

'না, ঐ যে শিবতলায় সন্ন্যেসী এসেছেন, উনি নাকি দৈবজ্ঞ। তিনিই এটা দিয়েছেন'—। বলতে বলতে কানের পাশে কালো রংটা আরও গাঢ় হয়ে উঠল।

আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'তোমার বুকের মধ্যে হোলি ক্রশ, আর হাতে মাতুলি!—তাও মহাপাপী হিন্দু সন্ন্যাসীর কাছ থেকে! কেন বলো তো?'

বুইদি হাত নেড়ে বললেন, 'শুধু কি মাতুলি নাকি? জিজ্ঞেস কর্ না ওকে, গত শনিবার সারাদিন উপোস করে ষষ্ঠীতলায় ইট বেঁধে এসেছে কিনা!' পরে সিয়োনের দিকে ফিরে বললেন, 'দেখ্, ফল হয় কিনা। এতেও যদি কোলে কিছু না আসে, তবে বাপু একবার ঘুরে আয় বাবার থান থেকে। হত্যে দিয়ে পড়ে থাকলে বাবা দয়া করবেনই।'

সত্যি তো, আজ সিয়োনের বিয়ে হয়েছে ছ'-সাত বছর; কিন্তু মা বলে ডাকলো না তো কেউ! মন ভরে না শুধু স্কুল আর বাড়ি, বাড়ি আর স্কুল করে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও কেমন যেন তিক্ততা আসে।

পাঁচুগোপাল দেখতে শালপ্রাংশু মহাভুজ। মস্ত বড় চেহারা, ভারি ভারি গড়ন, দুপদাপ পা ফেলে চলে। কিন্তু অতি নিরীহ। কথাবার্তা বড় একটা শুনিনি তার। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটিও কেমন যেন শুষ্ক কঠিন। দু'একদিন তাদের ঘরটিতে গিয়ে দেখেছি, স্বামী-স্ত্রীর সামান্য কথাবার্তাই হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। সিয়োনের ক্ষুদ্র চোখ দুটি ধক্ করে জ্বলে উঠেই নিভে গিয়েছে। পাঁচুগোপালের উদ্যত রোষবহ্নিও নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

সন্তান কামনায় ক্ষুব্ধ হতো সিয়োনের মন।

পাশের বাড়ির লরি-ড্রাইভারের ছোট ছেলেটি থপ থপ করে এসে দাঁড়ায় সিয়োনের ঘরের দরজায়। দুই চোখ জ্বলে ওঠে সিয়োনের—ছেলেটিকে কোলে তুলে জোরে চেপে ধরে বুকের মাঝখানটায়। হাসি-হাসি কচি মুখটা লাল আর বিকৃত হয়ে ওঠে। মুখটাকে আর একটু ঘষে দেয় নিজের কঠিন বুকে। যন্ত্রণা দেওয়ার মধ্যে এত উল্লাস!

একটু ফাঁক পেয়ে ডুকরে চেঁচিয়ে ওঠে অসহায় শিশু। ছেলেটির মা ছুটে এসে সন্তানকে ছাড়িয়ে নেয় সন্তানহীনার নিষ্ঠুর নিষ্পেষণ থেকে। পাড়া মাত করে গালাগালি দেয়, 'পোড়া পেটের বালাই নিয়ে বসে আছ, নিজের গুণে কুলোয় না, পরেরটা নিয়ে টানাটানি!'

স্কুলে মণিকাদি দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে তীব্রকণ্ঠে সিয়োনকে বললেন, 'ন্যুইসেন্স্! যদি ভদ্রলোকের মতো ব্যবহার করতে না পারো, তবে আমি তোমাকে ডিসচার্জ করতে বাধ্য হবো।'

এর পর অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য একেবারে চুপ হয়ে গেল সিয়োন—যদিও ক্ষণে ক্ষণে দৃষ্টিপাত করতো ছাত্রীদের নতুন জুতো অথবা হাতের সোনার রুলিটির ওপর।

সেবার গরমের ছুটিতে খবরটা শুনে মন খারাপ হয়ে গেল—সিয়োনের স্বামী নাকি আবার বিয়ে করেছে। কাছেই বাড়ি ভাড়া করে আছে। ছুটির পর স্কুলে ফিরে শুনলাম, বিয়ের ব্যাপারটা সিয়োনের কাছে মোটেই গোপন ছিল না। এমন কি স্বামীর ওপর অধিকার ছাড়তেও নাকি তাব কিছুমাত্র কষ্ট হয়নি। তবু কেমন যেন মায়া হলো মেয়েটার জন্য। কোনদিন মা-বাবার স্নেহ পায়নি। মিশনে আগাছার মতো বেড়ে উঠেছে। স্বামী-সুখেও বঞ্চিত হলো! সহানুভূতিতে বুকটা টন্‌টন্ করে উঠল।

একা পেয়ে সিয়োনের হাতখানা টেনে নিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কোন বাধা দাওনি?'

'ধেৎ, বাধা দেবো কেন? ও থাকলেই বা কি, আর না থাকলেই বা কি? আবার বিয়ে করেও কিচ্ছু হবে না, সব ঢুঁ ঢুঁ। ওর

দৌড় কতদূর জানি তো! হাসি পাচ্ছে ঐ বউটার কথা ভেবে।'

কুটিল কৌতুকের হাসি হেসে উঠল সিয়োন।

সহানুভূতি জানাতে গিয়েছিলাম কাকে? গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করে উঠল। চলে এলাম।

বছর খানেক পরে টিফিনের সময় বসে আছি স্কুলের টিচার্স কমনরুমে, ঘরে অনেকেই ছিলেন। সিয়োন যথারীতি আমার নতুন-কেনা শান্তিনিকেতনী ব্যাগটার ওপর হাত বুলোচ্ছে। দাম অনেকক্ষণ আগেই জিজ্ঞেস করা হয়ে গিয়েছে।

বুইদি ঘরে ঢুকেই সিয়োনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি গো সিয়োন, খবর পেয়েছ নাকি? কাল রাত্রে যে পাঁচুগোপালের একটি খোকা হয়েছে। আসবার সময় দেখে এলাম। দিব্বি নাদুস-নুদুসটি!'

'যা:, ওর আবার ছেলে হবে কি করে?'

বিস্ময়ে ঠিকরে পড়ে সিয়োন।

ওর কথা শুনে হেসে উঠলাম সবাই। একজন হঠাৎ বলে উঠলেন, 'তোমার হয়নি বলে কি আরেক জনের হবে না? বোকার মতো কথা বলো কেন?'

মড়ার মতো সাদা আর বিবর্ণ হয়ে উঠল সিয়োনের মুখ। এই প্রথম ও নিজেকে আবিষ্কার করল। আবিষ্কারের ব্যথায়, পরাজয়ের গ্লানিতে সিয়োন আস্তে আস্তে উঠে নিচে চলে গেল।

ওরই নারীদেহে মাতৃত্বের অভাব, একথা আজ ও মেনে নেবে কি করে?

বৈচিত্র্যালোভী মানুষের মন। অতি-পরিচিতের মধ্যেও

অভাবনীয়ত্বের স্বাদ পেতে চায়। আমার স্কুলের চাকরি-জীবন কেটেছে মন্দাক্রান্তা তালে ; নতুন নতুন ঘটনা ঘটবার অবকাশই বা কোথায়, আর তা উপলব্ধি করার মতো স্পর্শ-চেতন মনই বা কই ? কিন্তু তবু এগারটা-চারটের নিশ্ছিদ্র কর্তব্যের মধ্যেও মাঝে মাঝে অনাস্বাদিত মাধুর্য সঞ্চারিত হয়। তাই সে জীবনের একটি দিনের কথা ভুলতে পারিনি। স্মৃতির পট মলিন হয়ে যায়। হারিয়ে যাওয়া অনেক ঘটনার কথা কখনও মনে পড়ে, কখনও বা পড়ে না। কিন্তু সেদিনের ব্যাপার মনের মধ্যে যে ধাক্কা দিয়েছিল, তার জের সহজে মেটেনি। তাকে রসিয়ে রসিয়ে বলার মতো রসের ভাঁড়ারের চাবিকাঠি আমার হস্তগত নয়। তাই যথাসম্ভব নৈর্ব্যক্তিকভাবে সেদিনের বৃত্তান্ত নিবেদন করছি—যদিও জানি যে, চতুর্মুখ ব্রহ্মা যদি বক্তা হন, আর সিদ্ধিদাতা গণপতি হন লিপিকার, তবেই সে মহাভাষ্য রচনা সম্ভব।

ঝেড়ে পুঁছে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করা হয়েছে সম্পূর্ণ স্কুল বাড়িটিকে। আবর্জনার কিছুমাত্র চিহ্ন নেই স্কুলের সবুজ মাঠে। শিক্ষয়িত্রীদের সাজসজ্জায় পর্যন্ত এসেছে বৈচিত্র্য—ঈষৎ চাকচিক্য। আজকের দিনে তাঁরা যেন একটু সাবলীল, একটু বেশি সপ্রতিভ। মণিকাদি টেবিল গুছিয়ে বসে আছেন, স্কুলের ক্লার্ককে ডেকে ঘন ঘন উপদেশ দিচ্ছেন, আর মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে বাইরে গেটের দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করছেন। সব চেয়ে অভিনব ব্যাপার, স্বয়ং সেক্রেটারী আজ স্কুলে উপস্থিত। কেমন যেন একটু ব্যস্ত হয়ে কথা বলছেন একবার হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে, একবার ক্লার্কের সঙ্গে।

সপ্তাখানেক আগে থেকেই এই ব্যস্ততার মহড়া চলেছে। হেডমিস্ট্রেস টিচার্স মীটিং কল করেছেন, আমাদের প্রত্যেকটি ক্লাশের রেজিস্টারী খাতার অবশ্যকরণীয় কাজ ঠিক আছে কিনা দেখেছেন, ভূগোলের ওয়াল ম্যাপ, গ্লোব ইত্যাদি ও গার্হস্থ্য-বিদ্যার হাতেকলমে শিক্ষালাভ করার জিনিষপত্র গুছানো আছে কিনা লক্ষ্য করেছেন। যতদূর সম্ভব স্কুলকে এখন নিখুঁত করে সাজিয়ে রাখতে হবে।

'আর একটি কথা,' মণিকাদি মলিনাদির দিকে স্থির

দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'আপনাদের কয়েকজনের কাছে আমার আন্তরিক অনুরোধ, একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে আসবেন, একটু সজীব হয়ে চলা ফেরা করবেন।'

মলিনাদির নিষ্প্রভ চোখ দুটি আরও নিভে গেল, মুখ নিচু করে রইলেন। নাম না করলেও এইটুকু বুঝতে কারো বাকি রইল না, কথাটা সম্পূর্ণভাবে মলিনাদিকেই লক্ষ্য করে বলা। কোনদিনও যাঁকে সম্পূর্ণ আঁচড়ে চুল বাঁধতে দেখা যায়নি, অথবা যাঁর পরিধানে শাড়ি ব্লাউজ দুইই পরিষ্কার এমন কখনও হয়নি যাঁর নখে দাঁতে কখনই আমাদের স্বাস্থ্য বই-এর নিয়ম-নীতি পালিত হয় না।

মরমে মরে যাওয়া কাকে বলে, সে আমি জেনেছি এই মলিনা-দিকে দেখে। মস্তবড় একান্নবর্তী পরিবারের ঘরের বউ। তাই বলে সরমে বিজড়িত পায়ে তিনি চলতে পারেননি। পরিবারের দাবী মানতে গিয়ে তাঁকে শেষ পর্যন্ত চাকরি নিতে হয়েছে। শিক্ষক পিতা বিয়ের আগে সাত-পাঁচ ভেবে কালো মেয়েকে বি-এ পাস করিয়েছিলেন। জামাই মনে মনে শ্বশুরমহাশয়ের গভীর ভবিষ্যৎ দৃষ্টির উচ্ছ্বসিত তারিফ করেন। তিনি বাইরে কাজ করেন, মাসান্তে মাইনে পেয়ে একবার করে আসেন, দেখে যান সবাইকে।

মলিনাদির স্বামী-সৌভাগ্য আছে বলতে হবে। বিয়ের দশ বছরে তিনি চারটি সন্তানের মা হয়েছেন। আবার তিন মাসের জন্য লিভ্ এ্যাপ্লিকেশন করেছেন, আর সেইজন্য তাঁকে শুনতে হয়েছে মণিকাদির তীব্র ভর্ৎসনা।

'মেয়েদের একটু গুছিয়ে-গাছিয়ে বসাবেন, টেবিলে ডাস্টার-চক যেন গোছানো থাকে, আর', এবার মণিকাদি তাকালেন মিসেস চৌধুরীর দিকে, 'অন্ততঃ সেই দিনটাতে দয়া করে সবাই পাংচুয়াল হবার ও স্কুলে আসবার চেষ্টা করবেন। বাড়ির কাজ আর শরীর খারাপ একটু ঠেকিয়ে রাখবেন'—মণিকাদির কণ্ঠে ব্যঙ্গটা যেন বড় বেশি ধারালো হয়ে উঠল।

মিসেস ঊষা চৌধুরী, বছরে দু'শ' দিন আসেন দেরি করে। অন্ততঃ চার-পাঁচদিন অনুপস্থিত থাকেন প্রত্যেকটি মাসে। মণিকাদি মুখে বলেছেন, বকেছেন—অতঃপর ওয়ার্নিং হিসেবে গত মাসের মাইনে থেকে কিছু কেটেছেন।

স্কুলের মালি চারটে ডাব একসঙ্গে বেঁধে স্কুলের সামনের দালানে রাখতেই সেক্রেটারী ও মণিকাদি প্রায় একই সঙ্গে বললেন ডাব কটিকে কলের জলের চৌবাচ্চায় ভিজিয়ে রাখতে। কলকাতায় সেক্রেটারীর নিজের গাড়ি ছুটে গিয়েছে। আনবে ভীম নাগের সন্দেশ, কে. সি. দাশের রসগোল্লা, ফেরাজিনের কেক, নিউ মার্কেট থেকে ন্যাট্‌স্, সুন্দর পাতলা কাগজে মোড়া আপেল, আর সাদা রজনীগন্ধা ও লাল গোলাপের গুচ্ছ।

ওদিকে গার্হস্থ্য-বিজ্ঞানের শিক্ষয়িত্রী, সুলতাদি কয়েকটি করিত-কর্মা ছাত্রী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তাঁর লেবরেটারী অর্থাৎ রান্না ঘরে। সেখানে তৈরি হচ্ছে রাধাবল্লভী আর আলুর দম। হাতে-কলমে শিক্ষার ফল দেবে মুখে মুখে—সেইখানেই তো সার্থকতা।

বুইদিদি হাত নেড়ে একগাল হেসে ঈষৎ চাপা সুরে বললেন, 'আজ স্কুলের পাকা-দেখা রে ; প্রত্যেক বছরে একবার করে হয়!'

ঘটনাটির এতখানি ভণিতা করলেও, ব্যাপার অতি স্বাভাবিক। স্কুল ইন্সপেকসান হবে। আসবেন তিনটি জেলার সকল বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান পরিদর্শিকা মিসেস্ অবলা ঘোষ, এম-এ, বি-টি ; উপরন্তু ব্র্যাকেটে 'লণ্ডন'-লেখা একটা বিশেষ ডিপ্লোমা প্রাপ্তা।

রকমারি সুর-সম্বলিত হর্ন বাজিয়ে সাড়া দিয়ে শ্রীমতী অবলা ঘোষ এলেন। স্কুলের গেট খুলতে গিয়ে সেক্রেটারীর সঙ্গে দরোয়ানের প্রায় হাতাহাতি। সেক্রেটারী ছুটে এলেন আবার সিঁড়ির গোড়ায়, সেখানে আছে গাড়ির দরজা খোলার ব্যাপার।

শ্রীমতী ঘোষ গাড়ি থেকে নেমে এলেন। মণিকাদির সকল সাবধান বাণী উপেক্ষা করে ওপরের বারান্দা থেকে তাঁকে দেখলাম। দৈর্ঘ্যে সাধারণ বাঙালী মেয়ের ইঞ্চি ছয়েক ওপরে, দৈর্ঘ্যের ব্যালেন্স রক্ষিত হয়েছে প্রস্থে—অবলা কেন মা এত বলে!

পরিধানে জরির চুলপাড় গরদের ধুতি, কুঁচি দিয়ে সামনে আঁচল পা পর্যন্ত টেনে বাঁ দিকের কোমরে গুঁজে দেওয়া। গরদেরই ব্লাউজ—ঘটি হাতা। কান না ঢেকে সামান্য পাতা কেটে ঘাড় থেকে অনেকখানি উঁচুতে এক ধরনের পেঁচিয়ে খোঁপা বাঁধা,

বাঁ হাতের সুগোল মণিবন্ধে ছোট একটি সোনার ঘড়ি, তাতে সোনার বিছের ব্যাণ্ড। ডান হাতে কয়েকগাছি সোনার চুড়ি, কানে দুটি সাদা পাথরের টাব, গলায় ডবলবিছের হার। একটা মোটা সোনার বন্দুক দিয়ে কাঁধের আঁচল আটকানো। পায়ে উঁচু হিলের জুতো, হাতে প্রায় দেড় ফুট মাপের দামী চামড়ার একটি কালো ব্যাগ। তার বাইরের ছোট খোপে রাখা সাদা রুমালটি নিয়ে ঘন ঘন কপালের ঘাম মুছছেন। ঘাড়ের দিকে ডান পাশ ঘেঁষে ছোট এক ফালি জায়গা নিয়ে খানিকটা পাউডার জমাট বেধে আছে।

তিনি প্রথমে ঢুকলেন হেড্‌মিস্ট্রেসের ঘরে। সেখানে অফিস-সংক্রান্ত সব কিছু পরীক্ষা করে তারপর ক্লাশ পরিদর্শন করবেন। তখন আসবে আমাদের পালা।

ক্লাশে এসে বসলাম। অতিরিক্ত তালিম দেওয়ার ফলে মেয়েরা একেবারে চুপ করে গিয়েছে, মুখ শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। দু'একটি মেয়ে আবার ঘন ঘন বাইরে যাচ্ছে; তাদেরও এক বকুনি দিয়ে বসিয়ে দিয়েছি। দেখতে পাচ্ছি মুখগুলি ক্রমেই কুঁচকে আসছে। কিন্তু নিরুপায়—অঘটন ঘটলেও নিরুপায়।

ক্লাশ দেখলে মনে হবে না, কোনদিনও এখানে ছাত্রীরা পড়েছে বা আমরা পড়িয়েছি। সব কিছুই এত পরিষ্কার, এত পরিচ্ছন্ন। ঘরের কোথাও পড়ে নেই এক কুচো চিনেবাদামের খোলা, অথবা ছেঁড়া কাগজের টুকরো। ছাত্রীরা একটু বেশি ফিটফাট, বেশি কায়দা-দুরস্ত। আবহাওয়াটা অস্বাভাবিক। মাঝে মাঝে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে উঁকি মেরে দেখছি, তিনি আসছেন কিনা, কিংবা আসতে কত দেরি।

সেলাইয়ের শিক্ষয়িত্রীরা টিচার্স কমনরুমে মেয়েদের ক্লাশের তৈরি যাবতীয় হাতের কাজ এগ্‌জিবিশনের মতো সাজিয়ে রেখেছেন। সব কিছু খুঁটিয়ে দেখেন এবং খিঁচিয়ে ওঠেন, এই রকম প্রবাদ আছে মিসেস অবলা ঘোষ সম্পর্কে।

তোরা শুনিস নি কি, শুনিস নি তাঁর পায়ের ধ্বনি,
ঐ যে আসে, আসে, আসে।

তিনি আসছেন, পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি সিঁড়িতে, আর টিপ্ টিপ্ শব্দ হচ্ছে আমাদের বুকে।

এর পর শুরু হলো পরিদর্শন।

এক-একটি ক্লাশে ঢোকেন, তীরের ফলার মতো প্রশ্নবাণ ছোঁড়েন মেয়েদের দিকে। জিজ্ঞাসার মধ্যে কোন দয়া নেই, কোমলতা নেই—আছে শুধু উত্তাপ।

রক্তশূন্য পাংশুমুখে ছাত্রীরা নিজের নিজের জায়গায় বসে ঘামছে, গলা আটকে যাচ্ছে, কথা বেরুবে কি করে? অথচ আমরা জানি, মেয়েরা আজ যতদূর সাধ্য পড়াশুনো করে পুরনো পাঠ ঝালিয়ে এসেছে। উপরন্তু মণিকাদির চাপা নির্দেশে গুটিকতক ভালো মেয়েকে চারিয়ে বসিয়ে দিয়েছি। কিন্তু অদৃষ্টে দুঃখ থাকলে খণ্ডাবে কে?

মেয়েদের দাঁতের বাদ্যি অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। তায় বাদ সাধলো জিহ্বা, সংক্রামক ব্যাধির মতো তোৎলামিও এসে পড়লো। প্রশ্নের উত্তর কিছু পারলো, কিছু ঠেকে গেল।

মেয়েদের সামনেই পরিদর্শিকা ভর্ৎসনা করলেন সেই ক্লাশের দুর্ভাগ্য শিক্ষয়িত্রীকে। 'আপনার মেয়েরা যে বড্ড বেশি পড়াশুনো করছে! আপনি কি বলেন?' শেষের কথাটা মণিকাদিকে লক্ষ্য করে।

কিংবা, 'এই যে, দেখুন হেডমিস্ট্রেস, মেয়েরা কেমন সুন্দর ট্রানস্লেশন করেছে—আমরা আগামীকল্য বিদ্যালয়ে আসিব; তার ইংরেজী 'I came to school to-morrow'। টেন্স্-এর জ্ঞানও মেয়েদের হয়নি দেখছি।'

যথারীতি মেয়েদের সামনে তাদের মাননীয়া দিদিমণিকে ধমকে উঠলেন, 'গ্রামার-ট্রামারগুলো একটু ঝালিয়ে নেবেন।'

কিন্তু শ্রীমতী ঘোষ তো বুঝতে পারলেন না, কেন মেয়েরা ভবিষ্যতের স্থানে অতীত ক্রিয়া ব্যবহার করেছে। ছাত্রীদের অবচেতন মন স্কুল সম্বন্ধে উন্মুখ হয়ে নেই, তাই তারা আশ্রয় নিয়েছে পাস্ট টেন্স্-এর। ভবিষ্যতের ভাবনা অতীতেই ঝেড়ে ফেলতে চায়।

মিসেস অবলা ঘোষ এবার ক্লাশ নাইনে এলেন। এখন

কোরবানির পালা আমার। বুক ধড়ফড় শুরু হলো। ক্লাশ ফাইভে গিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'মিশরকে 'নীলের দান' কেন বলা হয়?' একটি ছাত্রী অনেক বুদ্ধি খরচ করে উত্তর দিয়েছিল, 'ওখানে খুব নীল চাষ হয়, তাই—'।

একটু আগেই তা আমার কানে এসেছে। তাই ফাঁসির আসামীর মতো বিরসমুখে উঠে দাঁড়ালাম। ইতিহাসের ক্লাশ।

'বলো তো, অশোক কেমন করে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন? How did he propagate Buddhism? তুমি, তুমি—বাঃ, ইতিহাসকে তো একেবারে টাইট করে মাথার মধ্যে জমাট বাধিয়ে রেখেছ, বেরুতে চায় না কিছুতে!' বলতে বলতে আমার দিকে ঘনঘন কটাক্ষপাত।

একটি মেয়েকে উঠে দাঁড়াতে দেখে বিস্ময় বোধ করলেও উল্লসিত হলাম। মেয়েটি পড়াশুনায় একেবারেই ভালো নয়। তাকে আড়ালেই বসিয়ে দিয়েছিলাম। বোধহয় আজ পড়ে এসেছে।

একটু জড়িয়ে জড়িয়ে বলে ফেললো, 'অশোক দু'হাত ওপরের দিকে তুলে গান গাইতে গাইতে যেতেন, আর তাঁর পেছনে সব লোক ছুটতো। এমনি করে তিনি বৌদ্ধধর্ম—'

মিসেস ঘোষ খুক্ করে কেশে মুখে রুমাল চাপা দিলেন। আমি নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলাম। মণিকাদি দৃষ্টি চালিয়ে দিলেন দূরে তালগাছের সারির মাথার ওপর দিয়ে।

সেলাইয়ের জিনিষগুলো দেখে কোনটাকে বললেন, 'মন্দ নয়'। কোনটাকে হাতে নিয়েই ছুড়ে দিলেন আবার টেবিলে।

'এটা কি 'হেরিং বোন' হয়েছে?'

কাপড়টা টেনে টেনে সেলাইর ফোঁড়গুলি দেখতে লাগলেন। 'ক'টা ডিপ্লোমা আছে আপনার? আর ওগুলো কি তৈরি করিয়েছেন, কাঁথা?'

জবাব দেবার মতো শক্তি সেলাইয়ের দিদিমণির ছিল না। অনেক কষ্টে, অনেক দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে বাল-বিধবা দিদিমণি সেলাইয়ের পরীক্ষায় পাস করেছেন। অবলা ঘোষের প্রশ্নের উত্তর তিনি কি করে দেবেন? এক-একটি ক্লাশের চল্লিশ-পঞ্চাশটি করে ছোট-বড়

মেয়ের দলকে সূঁচ সুতো ধরিয়ে সীবন শিল্পে পারদর্শিনী করা, আর পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘন করা একই ব্যাপার। কাঁধে বন্দুক উঁচিয়ে আসা অবলা ঘোষেরা কোনদিনই বুঝবেন না আমাদের মতো সাধারণ শিক্ষয়িত্রীদের ছাত্রীদের নিয়ে নিত্যনৈমিত্তিক কত কী সমস্যা, কত অসুবিধা।

'মেয়েদের হাতের কাজের দিকে আরও লক্ষ্য রাখবেন। মেয়েরা যেন—'

ইত্যাদি ইত্যাদি আরও কয়েক ঝুড়ি উপদেশ বর্ষণ করে মিসেস অবলা ঘোষ ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

নিচের একটা ভালো ঘরে টেবিল পেতে তার ওপর সাদা চাদর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল অনেক আগেই। তার চারপাশে খান-কয়েক চেয়ার। মাঝখানে পোর্সিলেনের 'ফ্লাওয়ার ভাসে' রজনীগন্ধা আর লাল গোলাপ।

ক্লাশ পরিদর্শন করা চারটিখানি কথা নয়। অবলা ঘোষের কপালে ইতিমধ্যেই বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে বেরোতে আরম্ভ করেছিল। তিনি রুমাল দিয়ে আল্‌তোভাবে চেপে চেপে ঘাম মুছে ফেলছিলেন। পরিদর্শনের পর রীতিমতো হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। তাড়াতাড়ি মণিকাদি তাঁকে নিয়ে গেলেন সাজানো ঘরটিতে। ফ্যানের নিচে, ফুলের স্তবকের সামনে চেয়ারে বসে মিসেস অবলা ঘোষ যেন খানিকটা আরাম পেলেন। মণিকাদি আর সেক্রেটারী আর দু'খানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

আগের থেকেই নির্দেশ দেওয়া ছিল। দুটি মেয়ে তাড়াতাড়ি নিয়ে এল খানকয়েক রকমারি ডিস্। তার আগে ডোমেস্টিক সায়েন্সের স্নুলতাদি নিয়ে এসেছেন বড় কাচের গেলাস। তার মধ্যে টুকরো টুকরো শাঁসসুদ্ধ বরফ মেশানো সুরভিত ডাবের জলের সরবত।

'সরবতটা খেয়ে নিন, বড্ড পরিশ্রম গিয়েছে আপনার।' সকাতর অনুনয় করলেন মণিকাদি।

টেবিলের ওপর সাজিয়ে দেওয়া হলো অন্যান্য ডিস্‌গুলো।

'আবার এত কেন?' সরবতের গেলাস খালি করে বললেন অবলা ঘোষ। সামনের দিকে টেনে নিলেন রাধাবল্লভী আর আলুর দমের ডিস। এরপরে আছে মিষ্টি, কেক আর ফল।

'এ সব মেয়েরা করেছে ? বাঃ, চমৎকার হয়েছে তো !' ভরাট গলায় বললেন অবলা ঘোষ। সুলতাদির ইঙ্গিতে মেয়ে ছুটি আরও খানকয়েক রাধাবল্লভী আর প্রমাণসই আলুর দম এনে দিলো টেবিলের ওপর।

'আরে করছ কি ? আমি একা কত খাবো ?' আলু জড়িয়ে একটা রাধাবল্লভী মুখে তুলে মোলায়েম স্বরে বললেন অবলা ঘোষ।

মণিকাদি বললেন, 'আপনি খেলে মেয়েরা খুশি হবে, আমাদেরও ভালো লাগবে।'

সেক্রেটারী সন্দেশের ডিসটি শেষ হবার অপেক্ষায় ছিলেন। ডিস খালি হতেই বললেন, 'স্কুলের গ্র্যাণ্টটা যাতে বেড়ে যায়, কাইণ্ডলি, আপনার রিপোর্টে একটু ফেভারেবলি রেকমেণ্ড করবেন। তা নইলে দেখছেন তো, এত বড় স্কুল মেনটেন করাই মুস্কিল··· না, না, রসগোল্লাটা আর ফেলে রাখবেন না···আপনার রিপোর্টের ওপরেই তো সব নির্ভর করছে···।'

হেসে সেক্রেটারী চুপ করলেন।

ছুটো চারটে করে নাট্স মুখে ছুঁড়তে ছুঁড়তে অবলা ঘোষ বললেন, 'কিচ্ছু চিন্তা করবেন না। আপনার স্কুলের জন্য আমি যথাসাধ্য করবো।'

টেবিল সাজানোয় কৃতিত্ব আছে !

ভদ্রমহিলা চলে যাওয়ার পর বুক-ভরে অক্সিজেন নিলাম। বাঁচা গেল।

শিক্ষা-বিভাগ থেকে আরও অনেক পরিদর্শিকা এসেছেন। সবাই মিসেস ঘোষ নন। দু'একজন এসেছেন যাঁরা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছেন শ্রদ্ধা আর সহানুভূতি নিয়ে; যাঁদের সুস্মিত ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ হয়েছি, আনন্দ পেয়েছি।

আবার এই শিক্ষা-বিভাগে দেখেছি এমন কয়েকজন মহিলা শিক্ষাবিদ্‌কে, যাঁদের নানা গুণপণা ও সৌজন্য থাকলেও সঙ্কুচিত হয়েছি তাঁদের উগ্রধরনের সাজ-সজ্জা ও রূপচর্চায়। মেয়েদের অসংযত বেশবাস দেখলে আমরা কটূক্তি করি, তীব্র সমালোচনা করি। কিন্তু এঁরা যখন মেয়েদের সামনে আসেন, তখন লজ্জা

হয় আমাদেরই। এনামেল করা মুখে, ম্যানিকিওর করা আঙুল উঁচিয়ে কোন মেয়েকে যখন জিজ্ঞাসা করেন, নখ না কাটার অপকারিতা, তখন আমাদের বিস্ময়ের ঝুলিতে আর কিছু বুঝি অবশিষ্ট থাকে না।

'আগে কিন্তু এত কড়াকড়ি ছিল না,' বুইদি এতক্ষণে মুখ খুললেন।

'ইন্সপেকট্রেস আসতেন, বেশিরভাগ ছিলেন লাল চেহারা মেমসায়েব। এসে আমাদের ইংরিজী বাংলা স্তোত্র শুনতেন, একটু হাতের লেখা দেখতেন—কেমন মিষ্টি মিষ্টি করে বাংলায় কথা বলতেন। ইচ্ছে করতো, আর একটু ধরে রাখি। যখন চলে যেতেন, আমরা গিয়ে ভিড় করে দাঁড়াতাম। মেমসায়েবের কাছে পুরো দু'দিনের ছুটি আদায় করতাম। তিনি হাত নেড়ে নেড়ে চলে যেতেন, আমরাও জোরে জোরে হাত নাড়তাম।'

শীলা মিত্র আমাকে প্রথম দিনেই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল সুলতা ধর আর রমলা বটব্যালের সঙ্গে। তাবও আগে শীলা এঁদের কিছু কিছু পরিচয় দিয়ে রেখেছিল। হেডমিস্ট্রেসের সব চাইতে প্রিয়পাত্রী সুলতা ধর আর রমলা বটব্যাল। তাই আর সকলের ডবল-সিটেড রুম হলেও এঁরা পুরো এক একখানা ঘর পেয়েছেন, পেয়েছেন আরও অনেক সুবিধা এবং স্বাচ্ছন্দ্য। এই বিশেষ মর্যাদাকে রক্ষা করবার জন্যই নাকি ওঁরা নিজেদের সযত্নে আলাদা করে রাখেন অন্য সকলের কাছ থেকে, মেশেন কম, কথা বলেন অল্প।

'আবার', শীলা একটু এগিয়ে এসে বললো, 'হেডমিস্ট্রেসের কানের কাছে সবায়ের নামে কুট্‌কুট্‌ করে লাগানোর স্বভাবও কম

নেই সুলতাদির। ভদ্রমহিলার অয়েলপেন্টিং আর কান ভারি করা একই সঙ্গে চলে।'

ঘন নীল রঙের ভারি পর্দা ঠেলে প্রবেশ মিললো সুলতা ধরের একক ঘরে। আসবাবপত্রের বাহুল্য নেই, কিন্তু রুচি ও পরিচ্ছন্নতার পরিচয় মেলে ঘরখানার সর্বত্র। ঘরের জানলায় সাদা পাতলা লংক্লথের পর্দা লাগানো, মাঝখানটায় কাটা, দু'দিকে খানিকটা করে গুটিয়ে বাইরের হাওয়া আসবার পথ করে দেওয়া হয়েছে। শেল্‌ফের ওপরে একটি নারকেল মালার ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখা পাতা শুদ্ধ করবীগুচ্ছ ঘরের মধ্যে সুবাস ছড়িয়ে দিয়েছে।

সাদা টেবিলক্লথ ঢাকা ছোট টেবিলটায় একখানা খাতা রেখে কি লিখছিলেন সুলতা ধর। আমাদের দেখে মৃদুহেসে অভ্যর্থনা করে বসতে বললেন; জিজ্ঞেস করলেন কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা।

মাথা নাড়লাম, চেয়ে দেখলাম মুখের দিকে। খাঁটি ভারতীয় শিল্পের পরিচিতি সুলতা ধরের মুখে। ঘন পল্লবাচ্ছাদিত দীর্ঘায়ত চোখ, আমাদের দেশের পটুয়াদের গড়া মা দুর্গার চোখের মতো ঈষৎ ওপর দিকে টানা। ভ্রমর-কৃষ্ণ দুটি টানা ভ্রূ, তিলফুল জিনি'নাসা—নাকের অগ্রভাগ একটু বেশি তীক্ষ্ণ। তার নিচে পাতলা ঠোঁটের ওপর নীলের আভাস। শীলার ভাষায়, 'ইঁদুরে গোঁফ, যখন নাড়ে তখনই সর্বনাশ।' আজানুলম্বিত কেশগুচ্ছ সকলকে বিস্মিত করে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, দোহারা গড়ন, আই-এ পাস, গার্হস্থ্যবিজ্ঞানের শিক্ষয়িত্রী। বেড কভার, টেবিলক্লথ আর ব্লাউজের হাতায় সূক্ষ্ম সূচিকর্মের পরিচয় মেলে এই বিশেষ জ্ঞানের। বি-এ পরীক্ষা দিয়েছিলেন, ফল হয়নি। শীলার মতে, 'একবার নয়, দু'-দু'বার ফেল করেও ভদ্রমহিলার লজ্জা নেই।'

কণ্ঠস্বর অতিমৃদু। প্রতিটি কথার সঙ্গে দুই ভ্রূ'র মাঝখানে দু'একটি কুঞ্চিত রেখা ফুটে ওঠে, আঁখি-পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দেয় একটা সন্দেহাকুল দৃষ্টি।

মিস ধরের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি প্রখর। তাই অতি কৌশলে, সকলকে এড়িয়ে হেডমিস্ট্রেসের অতি-সান্নিধ্যে পৌঁছে তাঁর

ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব লাভ করেছেন। চাকরি-জীবনে এর চাইতে আর কিছু সৌভাগ্য কল্পনা করা যায় না।

. সুলতা ধরের সব চাইতে দক্ষতার পরিচয় মেলে, যখন তিনি মণিকা রায়ের প্রতি-কথার তালে তাল দেন। মণিকাদি যদি বলেন, 'ক্লাশ ফাইভেব মেয়েগুলো এত দুষ্টু হয়েছে, ভারি জ্বালাতন করে।'—সুলতাদিও মাথা নাড়েন, 'সত্যি, ওদের দুষ্টুমির জ্বালায় তো ক্লাশ করাই কঠিন।'

'তবে প্রাণ আছে মেয়েদেব, দুষ্টুমিটা বেশ ভালোও লাগে।'

'হ্যাঁ, এখন থেকে মিন্‌মিনে হলে বড় হলে করবে কি? একটু দুষ্টু হওয়া, ছুটোছুটি করা ভালো, তাতে স্বাস্থ্যও ভালো থাকে।'—একইভাবে একটু কপাল কুঁচকে বলেন সুলতাদি।

মণিকাদি হয়তো বললেন, 'আজ বৃষ্টি হতে পারে। মেঘ করেছে বেশ।'

সুলতাদি সায় দিলেন, 'বৃষ্টি হবেই, যা মেঘ করেছে!'

'বলা যায় না, মেঘ উড়ে যেতে কতক্ষণ?'

'মেঘ করলেই বৃষ্টি হবে, এমন কোন মানে নেই।'

এমনি ধারা চলে সুলতাদির জল উঁচু আর জল নিচু খেলা—অতি কৌশলে, অতি নৈপুণ্যে।

মণিকাদি একটু রোদে হেঁটে এসেছেন, তাঁর জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে তাড়াতাড়ি লেবুব রস দিয়ে মিশ্রিব সরবত তৈরি করে তৃষাতুরাকে শান্তশীতল করে তুলেছেন সুলতাদি। টিফিনের সময় মণিকাদির ক্ষিধে পেয়েছে, রুটিতে মাখন লাগিয়ে কলার খোসা ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে দিয়েছেন সুলতাদি। মণিকাদিব পায়ের গোছাটা টন্ টন্ করছে,—গরম জলে তোয়ালে ভিজিয়ে সেঁক দিয়ে দিয়েছেন—ইত্যাদি হরেকরকমের সেবায় মণিকাদি মন্ত্রমুগ্ধ। তাই প্রতিদানে সুলতাদি যদি মাসের প্রথমে নিজের কোয়ালিফিকেশনের চেয়ে অনেকখানি ওপরের গ্রেডের মাইনেটা পান, তবে সে জন্য মানুষেরই মনোবৃত্তি দিয়ে গড়া হেডমিস্ট্রেস মণিকাদিকে দোষ দেওয়া যায় না।

স্কুল-কমিটির সুনজরে পড়বার চেষ্টা করতে গিয়ে সুলতাদি বিষ-নজরে পড়েছেন নিজের প্রত্যেকটি সহকর্মিণীর। কোন বন্ধু নেই,

শিক্ষয়িত্রীদের কারো সঙ্গে নেই তাঁর কোন প্রীতির বন্ধন। সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেও মুখ বাঁকিয়ে কেউ বলে উঠেছেন, 'ঐ কুট্‌কুটের দপ্তর, চললেন গজেন্দ্র-গমনে। কার মাথা খাবে, কে জানে!'

সুলতাদি আমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে ভাব জমাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আমরা কখনও বিশ্বাস করিনি তাঁর বিশ্বস্ততা বা সহৃদয়তাকে। তাই স্বাভাবিক নিয়মেই সুলতাদির মন বিষাক্ত হয়ে উঠতো এবং সেই মন নিয়েই হেডমিস্ট্রেসের কানে গিয়ে লাগাতেন এমন অনেক ঘটনা যা তিনি দেখেননি, এমন অনেক কথা যা তিনি শোনেননি।

সুলতাদির ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়েছি, কিন্তু কেমন যেন মাঝে মাঝে মনটা খারাপ হয়ে যেত। মানুষ সঙ্গলোভী। সে চায় প্রেম-প্রীতি, সহানুভূতি, সে চায় বন্ধুত্ব। দুর্ভাগা সুলতাদি; হাসি নেই, আনন্দ নেই,—নেই প্রাণ খুলে কথা বলার অবাধ্য আবেগ।

সুলতাদির দিকে তাকিয়ে থাকতাম আর ভাবতাম, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞানে যার জন্মগত ও সহজাত নৈপুণ্য, যে গড়ে তুলতে পারতো একটি সুস্থ সবল পরিবার, সে কেন এই পথে এল নিজেকে বঞ্চিত করতে! সেদিন উত্তর মেলেনি—মিলেছিল পরে।

স্বল্প মধ্যবিত্ত ঘরে মা বাপের প্রথম সন্তান সুলতাদি। সুলতাদির নিচে ভাইবোনের সংখ্যা উপেক্ষণীয় নয়। দরিদ্রের সংসারে প্রথম সন্তানের আদর তিনি পাননি, কিন্তু জ্যেষ্ঠ সন্তানের কর্তব্য দাবী করা হয়েছিল তাঁর কাছ থেকে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে। তাই ম্যাট্রিক পাস করেই ঢুকেছিলেন কাজে, তার জের সমানে চলেছে।

মাসের শেষে পয়লা তারিখে দরজার কাছে এসে বাবা বসে থাকতেন, সুলতাদির পারিশ্রমিকের প্রতিটি পয়সা গুণে গুণে মিলিয়ে নিতেন, তার ওপর মা খুঁটিয়ে বর্ণনা দিতেন নানা অভাবের, ভাইবোনেরা ঘিরে ধরে স্নেহের আবদার জানাতো।

কর্তব্যের ত্রুটি হলেই বাবা বলতেন, 'লেখাপড়া শিখিয়েছি, ছেলের মতো মানুষ করেছি, সংসারের ভার এখন তোমার।'

মা সখেদে শোনাতেন, 'মেয়ে না হয়ে যদি পেটে ছেলে ধরতাম···।'

· জাগতিক নিয়মে হয় ঋতু পরিক্রমা, সেই নিয়মেই আসে বসন্ত। সবুজ পাতার মঞ্জরীতে মুগ্ধ হয় মানুষ, স্বপ্ন মূর্ত হয়ে মালা হাতে এগিয়ে আসে। সুলতাদিও তার কাছে ধরা দিতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু প্রিয় কণ্ঠ সুশোভিত হবার সুযোগ পায় না।

সংসারের চাকায় তেল দেবার পথ রুদ্ধ হবার আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে বাবা প্রবল আপত্তি জানালেন, তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন, 'নিজের স্বার্থটাই শুধু চিনেছিস, মা-বাবা ভাই-বোন— সব ভেসে গেল!' তারপর শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলেন চোখে জল এনে ; ভগ্নস্বরে বললেন, 'বুড়ো বাপের দিকে তাকিয়ে, কচি ভাই-বোনগুলোকে দেখেও যদি যেতে চাস, তবে যা।'

মা কথা বন্ধ করে দিলেন, ভাইবোনেরা ম্লানমুখে দূরে দূরে সরে থাকতে লাগল। বসন্তে রাঙিয়ে ওঠা মন বৈশাখের খরতাপে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

তারপর আরও কত ক্লান্ত দিন কেটে গিয়েছে। পরের ভাইটি মানুষ হলো ; আর আশ্চর্য, মা বাবার আগ্রহ-আকূতিতে ছোট একটি বোনের বিয়েও হলো······রূপান্তর ঘটলো কত মনে, পরিবর্তন এল না শুধু সংসারের ঘানিতে। সেখানে টপটপ করে তেল ঝরতে লাগল অবিচলিতভাবে······।

হঠাৎ অনেকদিনের মর্‌চে-পড়া দরজার আগল খুলে গেল। সুলতাদির জীবনে আবির্ভূত হলেন মিস্টার মুখার্জী। ভদ্রলোক আর্মি-অফিসার, পদের উপযুক্ত চেহারা। কানের পাশে ছুটি একটি চুলে পাক ধরলেও শরীরের শক্তি, চোখের দীপ্তি তখনও হারিয়ে যায়নি। নীল্‌চে সবুজ রঙের সামরিক স্যুট পরতেন, কাঁধে থাকতো লাল সবুজ নীল প্রভৃতি কয়েকটি পৃথক রঙের পদমর্যাদাজ্ঞাপক ব্যাজ। ভারি পদক্ষেপে চলতেন, উচ্চকণ্ঠে কথা বলতেন, আর ঘর কাঁপিয়ে হাসতেন। মিস্টার মুখার্জীর পৌরুষ সহজেই জয় করে নিলো বুভুক্ষু শূন্যমনা সুলতাদিকে।

ঘর বাঁধতে বাধা আছে। মিস্টার মুখার্জী বিবাহিত।

ঘরে স্ত্রী আছে। রুগ্না স্বাস্থ্যহীনা স্ত্রীর কাছে তিনি কখনও পাননি সাগ্রহ আবেগ, সেই আদিম আরণ্য উল্লাস। স্ত্রীর সান্নিধ্যে মন উত্তপ্ত হতো না মিলিটারী অফিসার মিস্টার মুখার্জীর। তাই তিনি চাইলেন সুলতাদিকে, সুলতাদি পেলেন মিস্টার মুখার্জীকে।

আমরা সকৌতুকে দেখতাম সুলতাদির সযত্ন কেশ-রচনা, সৌন্দর্য-সাধন, সলজ্জ ভঙ্গিমা আর চলতে ফিরতে গুন গুন স্বরে গান।

ঝড় কখন কি ভাবে উঠবে, কেউ জানতে পারে না, তাই ভীরু পাখী নীড় খোঁজে। সে কামনা করে একটি নিভৃত আশ্রয়। আউটরাম ঘাটে বুফেতে বসে মিস্টার মুখার্জী আর সুলতাদি ঘনায়মান সন্ধ্যার আঁধারে শেষ রশ্মির খেলা দেখেন গঙ্গার টলোমলো বক্ষে। দুটি হাত একটি হয়, চোখে নেমে আসে স্বপ্ন মায়া। How long Oh Lord, How long! আর কত দেরি!

মিস্টার মুখার্জী সুলতাদির চোখে চোখ রেখে বলেন, 'সামনের জুনেই বিয়ে করবো, তারপর দু'জনে চলে যাব মুসৌরীর পাহাড়ে কিংবা গোপালপুরের সাগর পারে, শুধু তুমি আর আমি'—একটু দুষ্টুমি করেন মিস্টার মুখার্জী। বিদ্যুৎ খেলে যায় সুলতাদির দেহে মনে। নদীর বুক থেকে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ার আবেশ বুলিয়ে দেয় দুই চোখে···········

কিন্তু তবুও মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে যায়। আজ দু'বছর হয়ে গেল, মিস্টার মুখার্জী সুলতাদির কানে কানে গুঞ্জন করেছেন কত না-শোনা বাণী, তাঁকে নিয়ে গিয়েছেন ইডেন গার্ডেনে, বোটানিক্সে আর লেকের ধারে। দুটি জীবন একটি গ্রন্থিতে বাঁধা পড়বে, দুটি প্রাণের মিলিত ঝঙ্কারে সৃষ্টি হবে একটি অনাবিল শাশ্বত সুরের—কিন্তু সে কবে? কত দেরি?

যতবার প্রশ্ন করেন সুলতাদি, মিস্টার মুখার্জী উল্লেখ করেন নিকটতম লগ্নের। হাতে হাত জড়িয়ে বলেন, 'একপাশে নদী, অন্যপাশে কচি ধানে ভরা সবুজ মাঠ—তারি মাঝে থাকবে আমাদের ছোট্ট বাংলো, লাল টালি ছাওয়া সামনের বারান্দা—তাতে ঝুলবে অর্কিডের টব। বেতের সবুজ চেয়ারটিতে তুমি বসে থাকবে, আর আমি আঁকবো তোমার ছবি।'

মাথার ভেতরটা যেন কেমন করে ওঠে সুলতাদির, গোপালপুর ···মুসৌরী···আর একটি ছোট্ট বাড়ি···অর্কিড সবকিছু যেন ঘুলিয়ে যায়। মিস্টার মুখার্জী সুলতাদির হাতে ঈষৎ চাপ দিয়ে বললেন, 'আমার দিকে চেয়ে দেখো—' উন্নত কপাল, ঈষৎ কটা দপ্‌দপে দুটি চোখ, খড়্গের মতো তীক্ষ্ণ নাক, ধারালো হাসিমাখা দুটি ঠোঁট —পুরুষের ব্যক্তিত্বের কাছে প্রকৃতি আর প্রশ্ন করার থৈ পায় না। ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে সে ভাবে—স্বর্গের সুখ কি শুধু সেখানেই মেলে!

কিন্তু কাহিনীর জের আর কতদিন চলে? তাই একদিন এর পরিসমাপ্তি ঘটলো, নীল আকাশে হঠাৎ চমকে উঠলো বিদ্যুৎ, বজ্রের আঘাতে এক মুহূর্তে চুরমার হয়ে ভেঙে গেল নিভৃতমনের মাধুরী দিয়ে গড়া একটি অমিয় সৌধ।

বাইরে নটরাজের তাণ্ডব, মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক। অন্ধকার ঘরের খোলা জানলার গরাদ ধরে বসে আছেন সুলতাদি আর তক্তপোশের ওপর আমি। সুলতাদির হাতের মুঠোয় চিঠিখানা—মুচড়ে, দুমড়ে দলা পাকিয়ে গিয়েছে। একই লেখা, একই কাগজ, একই ঠিকানা থেকে এই ঠিকানায় এসেছে, তবু কত তফাত, কত প্রভেদ—

সুলতা,

ঘর বাঁধার জীবন আমার নয়, ঘরের স্বপ্নও আমি কোন দিন দেখিনি। তাই তোমার চাওয়ার সীমায় আমি পৌছতে অক্ষম। আমাকে ক্ষমা করো। ইতি—

পুনঃ—ইচ্ছে করেই দু'দিন দেরি করে চিঠিখানা পোস্ট করেছি। চিঠিখানা যখন তুমি পড়ছ, আমি তখন ট্রেনে—ফয়জাবাদের পথে।

অন্ততঃ মাসখানেক আমরা সুলতাদির মুখের দিকে তাকাতে পারিনি। ভেবেছি একটু কাছে গিয়ে বসি, সান্ত্বনার দু'একটা কথা বলি—কিন্তু সান্ত্বনা দেবো কাকে? আত্মীয়বিয়োগ বিধুরা, সন্তান হারা, না পতিহীনাকে?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বুইদি বলেছিলেন, 'ওরা যে ঝড়ো হাওয়া.

গাছের পাতাগুলোকে মাটির ধুলোয় ঝরিয়ে দিয়ে যায়। সাধ্য কি ওদের কেউ আটকায়!'

চেয়ে দেখলাম, বুইদির সামনের দিকে ঠেলে-আসা কপালে একটা একটা করে কত অভিজ্ঞতার রেখাই না দাগ কেটে যাচ্ছে।

বর্ষণ শেষ হয়ে গিয়েছে, মাটি হয়েছে কঠিন রুক্ষ, আর সে রুক্ষতার বুকে জন্ম নিয়েছে কুশাগ্রতীক্ষ্ণ ক্যাক্‌টাস। দিনের চাকা ঘুরতে থাকে কালের অমোঘ নিয়মে। কত ঘুম-না-আসা ত্রিযামা সুলতাদির চোখের কোলে এঁকে দেয় কালো অঞ্জনের কালিমা, কপালে বলিরেখার সংখ্যাবৃদ্ধি হতে থাকে। আকণ্ঠ তিক্ততায় মন বিষিয়ে ওঠে। তাই সুখের সংসার দেখে মুখ বিকৃত করে সুলতাদি বলেন, 'ট্র্যাশ।' উচ্ছলা নববিবাহিতাকে বলেন, 'লিগ্যাল প্রস্টিট্যুট্।' মলিনাদিকে লিভ্ এপ্লিকেশন লিখতে দেখে মুখ টিপে তীব্র শ্লেষের জ্বালা ছড়িয়ে বলেন, 'এটি নিয়ে ক'টা হলো?'

সুলতাদির কটু ব্যবহারে, তাঁর নীচতায় কতবার ক্ষুব্ধ হয়েছি, রাগ করেছি,—আবার মন ভরে গিয়েছে অনুকম্পায় বেদনায়। যে রিক্ত, যে পেয়েই হারায়, সে যে মরুভূমি, ওয়েসিসের চিহ্নমাত্রও নেই তার খরতপ্ত দূর দিগন্তে—তার আকাশ যে সদাই তৃষায় কাঁপে, তাই সে অন্যকে দিতে পারে না স্নেহের স্নিগ্ধ পরশ।

'Here is no water but only rock
Rock and no water and the sandy road.'

টিচার্স কোয়ার্টার্সের জীবন—'বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা' —নতুনত্ব নেই, নেই কোন অভাবনীয়ত্ব। আমাদের জীবন স্কুলের ছক কাটা রুটিনের মতোই বৈচিত্র্যহীন দৈনন্দিন পুনরাবৃত্তি মাত্র।

ওপরের ভাড়াটেদের একটি পড়ুয়া ছেলের ঘরে ভোর পাঁচটায়

রিন্‌-ঝিন্‌ শব্দে এলার্ম বাজে, শব্দে ঘুম ভেঙে যায় আমারও। বইয়ে পড়ি সুরের রেশের মতোই নাকি ঘুমের আমেজ। ঘুম ভাঙলেও আমেজ থাকে বহুক্ষণ। কিন্তু আমরা—এই কোয়ার্টার্সের শিক্ষয়িত্রীরা এই আবেশে সমাহিত হতে পারিনি কখনও।

বিছানা ছেড়ে উঠেই ছুটে যাই—কে আগে স্নানের ঘরে ঢুকবে। একটি মাত্র কল, দশটার মধ্যে জল চলে যাবে, আমরা এতগুলি প্রাণী, সমস্যাটা সীমাবদ্ধ, কিন্তু কম সঙ্কটপূর্ণ নয়। স্নানের ঘরে কার কতটুকু অধিকার, এই নিয়ে চলে কত বাগ্‌বিতণ্ডা, কত মনোবেদনা !

সকাল থেকে শুরু হয় লুকোচুরি খেলা, বুড়ী ছোঁয়ার সতর্ক চেষ্টা। দূর থেকে চেয়ে দেখি, তীর্থের কাকের মতো দাঁড়িয়ে আছেন বিরসমুখ জ্যোৎস্নাদি। আমাকে দেখেই দ্রুতবেগে ছুটে এসে ফিস্‌ফিসিয়ে জোরে বলে ওঠেন, 'দেখলি, আজও প্রমীলাদি সবাইকার আগে ঢুকেছেন। দরজার উপর গামছাখানা রেখে কেবল একটু ওদিকে গিয়েছি, তারই মাঝখানে কখন সুট করে ঢুকে পড়েছেন। দেখ্‌ তো কি অনাছিষ্টি। এখন থাকো দাঁড়িয়ে পাক্কা এক ঘণ্টা।' গজগজ করতে লাগলেন। ভেতর থেকেও একটা চাপা গর্জন ভেসে এল, 'দরজার গায়ে নাম ল্যাখা থাকলে……'

তারপরের দৃশ্য চায়ের টেবিল। সবাই জমায়েত হয়েছি। প্রত্যেকের সামনে ঈষৎ রঙ-চটা কাপে ধূমায়িত চা, আর দু'খানি করে বিস্কুট—টিচার্স মেসের সরকারী প্রাতরাশ। এর ওপর ক্ষুধা অনুসারে নিজ তহবিল থেকে যার যা খুশি কিনে খেতে পারে। তাই কেউ যদি তখন এক স্লাইস পাঁউরুটিতে মাখন মাখিয়ে খায়, তাতে কারও কিছু বলবার থাকে না।

চা খেয়ে যাই, স্বাদগন্ধহীন অতি বিশুদ্ধ চা। পাশের 'বনলতা টী স্টোর্সের' কানাইবাবুর ভাষায় 'ফ্রেস ফ্রম দি গার্ডেন।' প্রতিপাউণ্ড একটাকা বার আনা।

একজন মুখ বিকৃত করে বললেন, 'সামনের বর্ষায় জ্বরে পড়লেই এই চা দু'কাপ—ব্যাস, জ্বর পালাবার পথ পাবে না। 'একেবারে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরীর পাঁচন।'

আর একজন বলে উঠলেন, 'সে তো বটেই, এই চা-বাগানের

পাশেই তো আবার সিনকোনার চাষ ; তার ছোঁয়াচে এই চা ম্যালেরিয়ার পক্ষে অত্যন্ত উপকারী।'

জ্যোৎস্নাদি ছিলেন সেই মাসের মেস ম্যানেজার। একটু ঝাঁঝালো সুরে বললেন, 'ভালো গন্ধওয়ালা চা আমিও আনতে পারি ; কিন্তু মাসের শেষে হিসেবটা তো আবার আমাকেই দাখিল করতে হবে। তখন তো দুষবে আমাকে। পকেট বাঁচাতে গেলে অত রুচির দিকে তাকালে চলে না।' মোক্ষম কথা, উপরন্তু জ্যোৎস্নাদি কলহবিদ্যায় ডিগ্রী কোর্স সাফল্যের সঙ্গে শেষ করেছেন এবং তাঁর সরব কণ্ঠ সম্বন্ধেও আমরা অতিমাত্রায় সচেতন। সুতরাং জ্যোৎস্নাদির উক্তিকে নীরবে হজম করে নিলাম সবাই।

, এর পর যে যার ঘরে চলে গিয়ে শেল্‌ফের ওপর থাক করে রাখা স্তূপীকৃত খাতার গোছা টেনে নিয়ে পাতা খুলে লাল পেনসিলের দাগ কেটে ভুল সংশোধন করি। খাতা দেখতে দেখতে পিঠের শিরদাঁড়া বেঁকে যায়, ভুলে যাই আমাদের সত্তা আর আমাদের জীবন।

বেলা দশটায় ঝি মোক্ষদার আহ্বান আসে—খাবার জায়গা হয়েছে। যে যার চেয়ার টেনে বসে পড়ি। যথারীতি প্রমীলাদি জিজ্ঞাসা করেন, 'আজ তোমার মেনুতে কি কি রয়েছে বামুনদি?' ভাবলেশহীন মুখে বামুনদি উত্তর দেয়, 'এ্যাই, ডাল, চচ্চড়ি, মাছের ঝোল·········।'

'আবার সেই খচ্চড়ি? এটার মায়া আর ত্যাগ করতে পারছ না বুঝি?'

বামুনদি একটু ঝঙ্কার দিয়ে বলে ওঠে, 'তা কি করবো বলেন, সোনা দ্যান সোনা রাঁধবো, রুপো দ্যান রুপো।'

'সে তো বটেই,' বামুনদি খুব ভালো করেই জানে, মাংস পোলাওর জীবন আমাদের নয়।

বামুনদির একটা চোখ জন্ম থেকেই নষ্ট, কিন্তু অন্য চোখটি ঘূর্ণায়মান সার্চলাইট, ঘুরে ফিরে লক্ষ্য করে আমাদের প্রতিটি ভাবভঙ্গী। এই চোখটি দিয়েই আবার বহুদূরের জিনিষ লক্ষ্য করতে করতে কান দুটি যখন খাড়া করে রাখে আমাদের নিজেদের

মধ্যে নীচু স্বরে বলা কথাবার্তার দিকে, তখন সত্যি অবাক হতে হয় ওর মুখের নির্বিকার ভাবের অভিনয় দেখে।

. বুইদি বলতেন, 'ভগবান মেরেছেন, নইলে দু-দুটি আস্ত চোখ থাকলে বামুনদি আমাদের জজ ব্যারিস্টার হতো।'

ভাত খেতে বসে বড় বেশি কথাবার্তা হয় না। ঘড়ির কাঁটা লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যায়, কোনরকমে জল খেয়ে খেয়ে ভাত শেষ করি। মনে হয়, ঐ চচ্চড়িটাও যদি একটু ভালো করে চিবিয়ে খেতে পারতাম!

বুইদি সখেদে বলতেন, 'আমাদের খাওয়া তো নয়, এমনি করে গর্ত বোঁজানো'—গোটা হাতটা গলার মধ্যে ঢুকিয়ে দেবার একটা নিজস্ব মুদ্রা করতেন। উক্তিটি অতিশয়োক্তি নয়।

স্কুলে যাবার আগে প্রায় সবাই আরশিতে একবার করে মুখখানা দেখে নেন, কেউবা শেষবারের মতো মুখে পাউডারের পাফ্‌টা বুলোন—মুখের কালো তেল-তেলে ছোপটা যেন কিছুতেই যেতে চায় না।

জ্যোৎস্নাদি আরশিটাকে সামনে নিয়ে সকলের অলক্ষ্যে মাথার ওপরের উঁচিয়ে ওঠা পাকা চুলটিকে তুলে ফেলার চেষ্টা করেন। একটা তুলে ফেললে কি আর ছাই নিস্তার আছে? আশেপাশে আরও কয়েকটি লুকিয়ে থাকা সাদা চুল উঁকি মারে। তাদের আর ব্যবস্থা করাব সময় হয় না। জুতোয় পা গলিয়ে দ্রুতবেগে নেমে যান জ্যোৎস্নাদি।

স্কুলের পথ। আমরা এগিয়ে যাই, আগে পিছে চলে হেঁটে-যাওয়া ছাত্রীর দল। ছোট ছোট মেয়েগুলি নুয়ে পড়ে বই খাতার ভারে। এত বই নিংড়ে কতটুকু অমৃত ওদের ভাণ্ডারে জমা পডবে, জানি না,—জানে না কেউ। মেয়েদের দলটিতে কচি কলকণ্ঠ প্রাণের সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল, আমাদের দেখে থেমে গেল। ঠোঁটে আঙুল রেখে ক্লাশে তো কেবল চুপ করতেই শেখাই!

অদূরে একটা বাড়ির ভেতর থেকে হঠাৎ একটি ছেলে বেরিয়ে আসে সামনের বারান্দায়, যতক্ষণ না আমাদের দলটা চলে যায়, ততক্ষণ খুব ব্যস্ত ও চিন্তিত মুখে দূর দিগন্তে কি যেন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। আমাদের মধ্যে একজন চাপাস্বুরে বলে উঠলেন,

'রাস্কেল! রোজ একবার করে চাঁদমুখখানা দেখানো চাই। আমাদের বয়েসটার দিকেও একবার চেয়ে দেখে না!'

প্রমীলাদির দেশ পূর্ববঙ্গে; মেয়েদের পড়াতে গিয়ে তাঁর উচ্চারণ ভঙ্গী যথেষ্ট অসুবিধের সৃষ্টি করে; রেগে গেলে বুলি বেরোয় আরও চোস্ত, 'যদি আমরা এত বি-এ, এম-এ, পাস না কইর‍্যা একটা মিস্তিরি মেথরেরও বউ হইতাম, তবে কি অখনও মায়ের দুধ খাওয়া ঐ ছ্যাম্‌রা আমাগো দিগে ড্যাবড্যাবাইয়া চাইয়া থাকতে পারতো, না মণিরে আমরাই ছাইর‍্যা দিতাম! অহনে কিছু কইতে গ্যালেই ছাশ সুদ্ধা লোক ধাইয়া আস্‌বওনে মাস্টারণীগো দিগে…'

হেসে বললাম, 'তবে তো ছেলেটিকে সহজেই জব্দ করা যায়—আপনি যদি বিয়ে করেন। আপনি হবেন আমাদের অনারেব্‌ল্‌ রিপ্রেজেণ্টেটিভ।'

'রয়েন, আগে বাগবাজারের বাড়িটা হাত কইর‍্যা লই, বিয়া পরে হইবোনে।'

টিচার্স মেসে বাস করতে গিয়ে জেনেছিলাম, প্রমীলাদির পরিচয়। প্রমীলা রায়চৌধুরী বাংলা সাহিত্যে এম-এ; তার ওপর বি-টি। পূর্ববঙ্গের এক বিত্তশালী জমিদার কন্যা। পিতার মৃত্যুব পর একমাত্র ভাইয়ের মালিকানা বোনের সহ্য হয়নি। ছেলেমেয়েকে উচ্চ শিক্ষা দেবার জন্য পিতা কলকাতাতেও খানদুয়েক বাড়ি করেছিলেন, তার মধ্যে বাগবাজারের বাড়িটা নাকি লিখে দিয়েছিলেন মেয়ের নামে।

'ঐ দলিলটা যে কেমন কইর‍্যা হাতাইল ঐ লক্ষ্মীছারা ভাই,—তবে এই-ও আমি কইয়া রাখলাম, ঐ বাড়ি লইয়া তবে ছারুম—আমিও হরিচৌধুরীর মাইয়া!'

হরিহর রায়চৌধুরী হতভাগ্য স্বর্গীয় পিতার নাম।

প্রমীলাদি বিপুলা, শ্যামা। সাজগোজের প্রাচুর্য হাস্যকর, কার্পণ্যে অসামান্যা। কথায় কথায় সংঘর্ষ বাধলে তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন, প্রতিবাদ করলে কণ্ঠস্বরকে আরও উচ্চমার্গে তুলে ধরেন। সব চাইতে মজার ব্যাপার ঘটতো, যখন তাঁকে আমরা রোমান্সের হাওয়ায় ফুলিয়ে দিয়ে আবার চুপ্‌সে দিতাম অকস্মাৎ ভাইয়ের কথা তুলে।

'সত্যি, চুল ছেড়ে দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকলে আপনাকে যে কি চমৎকার দেখায় প্রমীলাদি! আমেরিকার মতো জায়গায় থাকলে আপনার চোখ দুটির জন্য ইন্‌সিওরেন্সের এজেন্টরা ছুটোছুটি করে পায়ের তলা খসিয়ে ফেলতো।'

'হঃ······তোমাগো যত রসের মন······অখন আর আমার চোখের কি আছে···'

'তবুও যা আছে প্রমীলাদি, সানাই বেজে উঠলো বলে। লাল বেনারসী পরে···ওঃ, সে যা দেখাবে!'

'লাল রঙ আমার এট্টুও ভালো লাগে না, আমি নিজে পছন্দ কইর‍্যা কিনুম, ময়ূরকণ্ঠী রঙ—ভালো দেখাইব না?'

হাসি চেপে রাখা দায়। 'সবই তো হতো, কিন্তু আপনার ঐ বাগবাজারের বাড়িটা না যতদিন···'

'ঐ হারামজাদা ভাই যত নষ্টের গোরা—একটা আস্তা পাঠা কালীতলায় মানত কইর‍্যা আইছি, মকদ্দমায় ও হারবো, হারবো—এই আমি কইয়া রাখলাম।'

বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে সেই সরোষ উক্তি।

অনেকদিন পরে খবর পেয়েছিলাম দুরন্ত বসন্তরোগে প্রমীলাদি হাসপাতালে মারা গিয়েছেন,—অনাত্মীয়ের মাঝে, অসহায়ের মতো।

বাগবাজারের বাড়ির খবরটা এখনও জানতে ইচ্ছে করে।

সুনয়নীদির কাছে বসে শুনছিলাম কোটালীপাড়ার মহিলা বৈয়াকরণ ও ন্যায়শাস্ত্রী শ্যামাসুন্দরীর কথা।

'সুলতানা রিজিয়া আর রাণী এলিজাবেথ তো তোর ঘরের মানুষ। কিন্তু কখনও কি খোঁজ নিয়েছিস দ্রবময়ী কে ছিলেন? খানাকুল কৃষ্ণনগরের চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের বিধবা মেয়ে দ্রবময়ী? বুড়ো বাবা যখন অশক্ত হয়ে পড়লেন, তখন টোল চালিয়ে সংস্কৃত পড়াতেন এই মেয়ে, খাঁটি সংস্কৃতে অনর্গল কথা বলতেন, পণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধে হারিয়ে দিতেন, ঠিক পুরুষদের মতোই কোন সঙ্কোচ না

রেখে শাস্ত্র বিচার করতেন। সেদিনের গোঁড়া সমাজে কত কঠিন আর শক্তিময়ী ছিলেন এই ব্রবময়ী!'

কোণারকের সূর্যমন্দিরের সামনে বালিয়াড়ীর ওপরে উদ্ধতশাখা বনঝাউয়ের সারি দেখেছি। ঋজু ডালপালা মেলে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। অনসূয়াকে দেখে সেই কথাই মনে হতো।

স্কুল ও টিচার্স কোয়ার্টার্সের তুচ্ছ বৃহৎ সব কিছু ঘটনা থেকে নিজেকে আলাদা রেখে এক বিস্ময়কর স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছিল অনসূয়া ঘোষ। অর্থনীতিতে এম-এ; দিদির কলেজজীবনের বন্ধু মণিকাদির আহ্বানে চারুসুন্দরীতে এসেছিল। বয়স পঁচিশের ওপর নয়, কিন্তু অল্প বয়সের চাপল্য স্থান পায়নি অনসূয়ার ঋজু, দৃঢ় দেহভঙ্গিমায় আর কঠিন মুখে। রং শ্যামলা, মুখের মধ্যে তীক্ষ্ণ নাকটা চোখে পড়তো সকলের আগে। কালো কুচকুচে মোটা ভ্রূ'র নিচে ছোট ছুটি চোখ, মাথার চুলগুলি ঈষৎ কোঁকড়ানো, ঠোঁট ছুটি পুরু, দৃঢ় সংবদ্ধ। অকারণে সে হাসতো না, অপ্রয়োজনে সে কথা বলতো না। অতি সাধারণ চেহারার মধ্যেও কি যেন এক বৈশিষ্ট্য ছিল, যার জন্য তার স্বাতন্ত্র্যবোধকে আমরা সবাই মেনে নিয়েছিলাম। পিঠের শিরদাঁড়া সোজা রেখে, মাথা উঁচু করে ঠোঁট ছুটি একটু জোর করে টিপে ধরে অনসূয়া যখন হেঁটে যেত রাস্তায় কিংবা স্কুলের করিডরে, তখন তার গতিকে অযথা বাধা দেবার বুঝি কেউ থাকতো না। সহজাত এক অপূর্ব ব্যক্তিত্বে শক্তিময়ী ছিল অনসূয়া ঘোষ। তাই তাকে মনে মনে সমীহ করে চলতাম আমরা সবাই, এমনকি মণিকাদিও। কারণ এই অনসূয়াই ছিল একমাত্র শিক্ষয়িত্রী যে চাকরি নেওয়ার অল্পদিন পরই বিনা দ্বিধায় নির্ভয়ে মণিকাদির দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'একজনের পক্ষে একসঙ্গে এত সেট খাতা দেখা সম্ভব নয়, আপনি এটা একটু ঠিক করে দিন।'

'তোমাকে তো আর দিইনি, তবে তুমি বলতে এসেছ কেন?' মুখ কালো করে মণিকাদি উত্তর দিয়েছিলেন।

বাৎসরিক পরীক্ষার খাতা বণ্টন নিয়ে এই গোলমালের শুরু।

মণিকাদি পরীক্ষার খাতা বন্টনে কোনদিনই সাম্যবাদের পরিচয় দেননি ;—আমরাও মাথা ঘামাইনি আমাদের কয়েকজনের কেন আট সেট, আর সুলতাদি, রমলা বটব্যালের কেন মাত্র তিন বা চার সেট করে খাতা। আমরা জানতাম, এটাই নিয়ম। অনসূয়া জানালো, এটা অনিয়ম।

'আমার সম্বন্ধেও এই অবিচার হলে বলতাম, বৈকি! এখন অন্যের পক্ষ নিয়ে বলছি। আপনি ঠিক করে দেবেন।'

'তুমি আমাকে হুকুম করতে পারো না।' মণিকাদির দু'চোখ জ্বলে উঠেছিল।

'আপনাকে হুকুম করবো—এত অভদ্র আমি নই ; তবে অনুরোধ করছি—ওটা ঠিক করে দেবেন।'

আদেশের সুরে অনুরোধ করে অনসূয়া ধীরগতিতে চলে গিয়েছিল, মণিকাদিও চলে গিয়েছিলেন অফিসরুমে।

জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ! অনসূয়ার চাকরি থাকবে তো? এর পরেও অন্তত: একবছর অনসূয়া আমাদের স্কুলে ছিল এবং যথানিয়মেই সে কাউকে ছেড়ে কথা বলতো না। বলা বাহুল্য, মাঝে মাঝে সংঘর্ষ বাধতো মণিকাদির সঙ্গে।

এমনি করে শুধু খাতা নিয়েই নয়, রুটিন এবং শিক্ষয়িত্রী সম্পর্কিত আরও অনেক কিছু বিলিব্যবস্থা নিয়ে, যেখানে মণিকাদির দিক থেকে বিন্দুমাত্র অবিচারের ছাপ থাকতো, অনসূয়া ঘাড় উঁচু করে কিছুমাত্র সঙ্কোচ না করে প্রতিবাদ করতো। মণিকাদির কথার জবাব আমরা দিতে পারিনি ; আমাদের হয়ে জবাব দিতো অনসূয়া। সেজন্য মনে মনে ওকে তারিফ করেছি যথেষ্ট। কিন্তু যখন আমাদেরও কাজের বা কথার প্রতিবাদ করতো ঠিক ঐ রকম স্পষ্ট ভাষায়—স্বভাবতঃই ওর বিরুদ্ধে মনটা একটু খিঁচিয়ে যেত। সুলতাদি যখন ঘাড় নেড়ে কপাল কুঁচকে মণিকাদির কথায় তাল দিয়ে বলতেন, 'সত্যি, এ ভারি অন্যায়'—

কাটা ঘায়ে নুন ছিটনোর মতোই অনসূয়া বলে উঠতো, 'আপনিও একেবারে সঙ্গে সঙ্গে অন্যায় দেখে ফেললেন? এ-ও তো ভারি অন্যায়।'

তাই সুলতাদি মণিকাদির ছায়ায় থেকেও রীতিমতো ভয় করে চলতেন অনসূয়ার স্পষ্ট কথাকে।

অনসূয়া কথা বলতো কম, বই পড়তো প্রচুর; কোয়ার্টার্স বা স্কুলের মেয়েলি ব্যাপার নিয়ে উৎসাহ দেখাতো না একটুও। কত সময় স্টাফরুমে পাঁচমিশেলী গল্প করতে করতে এক ফাঁকে ওর দিকে তাকিয়ে দেখেছি, হয়তো বা ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য; কিংবা আমি এই মাত্র যে হাসির কথাটা বললাম, তাতে ওর মুখেও একটু হাসির রেখা ফুটে উঠলো কিনা—লক্ষ্য করবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বৃথা। একভাবে অনসূয়া উল্‌টে যেত হাক্‌স্‌লি বা রাসেলের মোটা মোটা বই-এর পাতা।

মাঝে মাঝে রাগ হতো অনসূয়ার ওপর। মনে হতো, অনসূয়া আমাদের অবজ্ঞা করে, আমাদের সঙ্গে মিলেমিশে চলা অথবা গল্প করাকে ও মনে করে সময় নষ্ট। তাই যখন আমরা সকাল বেলা চা খাওয়ার পরেও টেবিলে বসে কারও অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তার সম্বন্ধে সরস সমালোচনা করতাম, অনসূয়া তখন সশব্দে চেয়ারটা পেছনে ঠেলে দিয়ে খবরের কাগজটা নিয়ে চলে যেত ওর ঘরে—স্পষ্ট কানে বাজতো ওর সগর্ব পদক্ষেপ।

সুলতাদি চোখ কুঁচকে বলতেন, 'ওর বাড়াবাড়িটা যেন বড্ড বেশি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।'

প্রমীলাদি ওঁর স্বভাবসিদ্ধ বাঁকা ভাষায় বলতেন, 'ইয়ারে কয় ঢং; চলনে বলনে ফেশান দেখাইয়াই যেন চিরটাকাল রাণী ভিক্টোরিয়ার জীবন কাট্‌বো।'

বলতে গেলে আমার মনটাও যেন কেমন নিশপিষিয়ে উঠতো অনসূয়ার বিরুদ্ধে। কিন্তু বৃথা—প্রতিবাদ করতে পারতাম না ওর সতেজ ব্যবহারকে।

একবার মনে আছে মণিকাদির কথার উত্তরে অনসূয়া মাথা উঁচু করে চলে যাওয়ার পর আমি বলেছিলাম, 'ওর চোখের দৃষ্টিটা পর্যন্ত কী কঠিন!'

রাগতকণ্ঠে মণিকাদি বলেছিলেন, 'কঠিন হবে না? ওকি আর তোমার আমার মতো সহজ মেয়ে? ডাকাতে বাড়ির মেয়ে, ডাকাতের মতো হাবভাব। সবসময়েই উগ্রচণ্ডা।'

'ডাকাতে বাড়ির মেয়ে? তার মানে?'

'মানে অতি সোজা। ওর দিদিকে চিনি তো, ওর দাদার নামও আমাদের ছাত্রীজীবনে কম পরিচিত ছিল না। ওর বাবা জ্যাঠা পর্যন্ত ঐ দলের!'

আমার কৌতূহল-বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকিয়ে মণিকাদি বললেন, 'সে খবর বুঝি রাখ না? সেই যে আমাদের দেশের একদল লোক চেষ্টা করেছিল পিস্তল ছুঁড়ে দু'চারজন সাহেবকে মেরে ফেললেই দেশ একেবারে স্বাধীন হয়ে যাবে। ওর বাবা জ্যাঠা দাদা দিদি—সবই ঐ দলের। বন্দুক পিস্তল তো ছিল এদের হাতের কাঠি। ওর দিদি জয়ার সঙ্গে তো আমরা সহজে কথা বলতাম না। কি জানি কখন দুম্ করে গুলী করে বসে। ছাত্রী নিবাসে একসঙ্গে থেকেছি; কতদিন রাত্রিবেলা দেখেছি, জয়া বাথরুমের পেছনের ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নেমে বেরিয়ে গিয়েছে, আবার শেষরাত্রিতেই চলে এসেছে। দরোয়ানকে যে কি করে হাত করেছিল ও-ই জানে। আমাদের তো বলে রেখেছিল, সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট-এর কানে এ কথা লাগালে ফল ভালো হবে না। কথা বলতো ঐ অনসূয়ারই মতো—ঘাড় সোজা রেখে স্থিরদৃষ্টিতে।'

অত্যুগ্র আগ্রহে শুনে যাচ্ছিলাম মণিকাদির কথা। তিনিও বোধহয় কিছুক্ষণের জন্য তাঁর অতীত জীবনে ফিরে গিয়েছিলেন।

'একদিন আর কিছু গোপন রইলো না, শেষরাত্রিতে পুলিশে ঘিরে ফেললো সমস্ত ছাত্রীনিবাসটি। একটা টেররিস্ট পার্টির কর্মী মেয়ে কলেজের ছাত্রী জয়া ঘোষ। ঠিক তেমনি মাথা উঁচু করেই জয়া প্রিজনার্‌স্ ভ্যানে উঠে বসলো।

'গাড়িটা চলে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্টের আহ্বানে আস্তে আস্তে ফিরে এলাম নিজেদের ঘরে। ঘরের অবস্থা দেখে মনে হলো, এই মাত্র যেন একটা যুদ্ধের ঝড় বয়ে গিয়েছে ওলটানো-ছিটকানো তোষক-বালিশ আর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলা বইখাতার ওপর দিয়ে। পুলিশ সার্চ করেছে তন্ন তন্ন করে। যদি পারতো তবে বুঝি দেয়ালের সিমেন্টের আস্তর পর্যন্ত খসিয়ে দেখতো ওখানেও কোন বাঘের গন্ধ পাওয়া যায় কিনা।'

মণিকাদি চুপ করে রইলেন অনেকক্ষণ—আমিও।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপর জয়া ঘোষের কি হলো?'

'সে কি আর ছাই আমরা জানি?—না আমাদের কিছু জানতে দেওয়া হয়েছিল? শুনেছিলাম ওকে প্রথমে লর্ড সিংহ রোডে নিয়ে যায়, সেখান থেকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, তারপর হিজলী। অনসূয়ার কাছে খবর পেলাম, শেষের দিকে ছিল মাদ্রাজের একটা টি. বি. স্যানাটোরিয়মে। একেবারে শেষ হয়ে যাবার আগে ওকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছিল। তার ছ'দিন পরেই জয়া মারা যায়।'

মণিকাদির গলাটা ধরে এসেছিল। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম,—শান্ত, গম্ভীর।

'ঐ জয়ার কথা মনে করেই কেন জানি অনসূয়াকে কিছু বলতে পারি না।'

সেই অগ্নিযুগের মেয়ে জয়া ঘোষ। তার ছোট বোন অনসূয়া। স্বদেশী ডাকাতের মেয়ে! তাই সে আগুনের ফুল্‌কী, এত কঠিন, এত তীব্র,—সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ভয়ে নয়, রোমাঞ্চে।

খুব ছোট বেলা, ক্লাশ টু-থ্রিতে পড়ি। ছিলাম ময়মনসিংহে; আর একটু বড় হয়ে এলাম চট্টগ্রামে। পূর্ব পাকিস্তানের দুটি জেলা—অগ্নিযুগের দুটি অগ্নিকুণ্ড, দেশমাতৃকার চরণে ভক্তি অর্পণের দুটি যজ্ঞশালা—মনের কোন্ গহন কোণে সুপ্ত ছিল আমার সেই দেখা-না-দেখা, আর শোনা-না-শোনার স্মৃতি-কাহিনী, হঠাৎ যেন নাড়া খেয়ে হুড়মুড় করে একসঙ্গে বেরিয়ে এল অনেক, অনেক জটপাকানো কথা।

ময়মনসিংহে তখন সবে স্কুলে ভর্তি হয়েছি, ফ্রক পরে বইখাতা নিয়ে ঝিয়ের সঙ্গে টুক্‌টুক্ করে স্কুলে যাই, বাড়ি আসি, সমস্ত বিকেল ধরে সামনের মাঠটিতে খেলা করি—ছেলেমেয়ে মিলিয়ে সঙ্গী জোটে অনেক। হঠাৎ একদিন বন্ধু লতিকা এসে বললো, "এই, ছোরা লাঠি খেলা শিখবি? মিনতিদের বাড়ির পেছনে যে জায়গাটা আছে, সেটা বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। সেখানে প্রত্যেকদিন বিকেলে বরুণাদি ছোরা খেলা আর লাঠি খেলা

শেখাবেন। যাবি তুই? আমার দিদিকে বরুণাদি নিজে এসে ডেকে নিয়ে গিয়েছেন। আমিও আজ থেকে যাব।'

বরুণাদি কে, জিজ্ঞেস করতে লতিকা এমন করে আমার দিকে তাকালো যে, চাউনিটা এখনও আমার মনে আছে, "ইঃ মা, তুই বরুণাদিকে চিনিস না? সেই যে রে একদিন এইখান দিয়ে মিনতিদের বাড়িতে যাচ্ছিলেন, আমাকে এখানে দেখতে পেয়ে ডাকলেন, গালটিপে আমাকে কত আদর করে কত কি জিজ্ঞেস করলেন, তুই দেখিসনি? তুই কী রে?'

সত্যিই খুব লজ্জায় পড়লাম, আর বলতে পারলাম না যে, বরুণাদিকে আমি চিনি না।

একদিন দেখলাম বরুণাদিকে।

লতিকাকে দেখে আমিও বাড়িতে আব্দার ধরেছিলাম, বরুণাদির কাছে ছোরা খেলা শিখবো। ছেলেমানুষের আব্দারে কেউ বাধা দেননি। লতিকা একদিন আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল ওদের আখড়ায়। গিয়ে দেখি প্রায় চল্লিশটি মেয়ে জড় হয়েছে, প্রত্যেকেরই হাতে রয়েছে টিনের তৈরি মুখ ভোঁতা ছোরা, কয়েকজনের হাতে ছোট বাঁশের লাঠি। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বাইশ-তেইশ বছরের একটি মেয়ে হাসি হাসি মুখে একটা মোটা খাতা নিয়ে মেয়েদের নাম ডাকছেন। নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখলাম বরুণাদিকে। বড় হয়ে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'তে যখন সুমিত্রার চেহারার বর্ণনা পড়েছিলাম, তখন বার বারই মনের সামনে ভেসে ভেসে উঠেছিল কোন্ ছোটবেলায় দেখা বরুণাদির মুখ। মানুষ এত সুন্দর হয়!

চমক ভাঙলো বরুণাদির কথা শুনে। আমাকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'আজ থেকেই খেলা শিখবে তো?' মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিলাম।

মনে আছে, প্রত্যেকদিন কী আগ্রহেই না বিকেলের জন্য অপেক্ষা করে থাকতাম। খেলার জন্য নয়, বরুণাদির জন্য। হাসিমাখা বড় বড় দুটি চোখের কী প্রচণ্ড আকর্ষণ! স্কুলের ছুটির পর বাড়ি এসে বইখাতা কোনরকমে ফেলে রেখেই ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করতাম মাঠে; বরুণাদিকে না পেলে আবার ছুটে যেতাম বরুণাদির বাড়িতে। ছোট্ট বাড়িটি ছবির মতো পরিষ্কার; বাড়িতে

কেবল বরুণাদির বিধবা মা, বরুণাদির মতো গায়ের রং, তাঁরই মতো নিখুঁত চোখ, নাক, মুখ।

রূপ আর বুদ্ধি এই দুই-এর অপরূপ সমন্বয় ঘটেছিল বরুণাদির মধ্যে। তাই তিনি ছিলেন মোহিনী, অতুলনীয়া। কুড়ি টাকা স্কলারশিপ পেয়ে ময়মনসিংহের যে স্কুল থেকে বরুণাদি ম্যাট্রিক পাস করেছিলেন, বি. এ. পাস করে ঐ স্কুলেরই শিক্ষয়িত্রীর পদ পেয়েছিলেন। আই-এ, বি-এ-তে ফল হয়েছিল অতি সাধারণ। কলেজে পড়তে গিয়েই তিনি অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। পাঠ্য বই-এর সঙ্গে কিছুমাত্র যোগাযোগ না রেখেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা উৎরে যাওয়া যায় কিনা সেটা প্রমাণ করবার জন্যই বোধ করি বরুণাদি পরীক্ষা দিয়েছিলেন।

কিছুদিন পরেই চলে যাই চট্টগ্রামে; স্মৃতিরপটে আটকে রইলেন বরুণাদি।

১৯৩১ সাল। সবে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়েছে। সমস্ত শহরটিতে সে কী চাপা উত্তেজনা, চোখে চোখে সে কী বিদ্যুৎময় ইঙ্গিত! অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলা চলেছে চট্টগ্রাম কোর্টে; ইংরেজ জজসাহেব বিচার করছেন। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতাম, জজসাহেবের যাওয়ার সময় হলেই রাস্তার দু'পাশে কিছুটা দূরে দূরে পুলিশ দাঁড়াতো, আর খানিকটা পরেই হুশ্ হুশ্ করে চোখের পলকে চলে যেত রাইফেল উঁচিয়ে ধরা সৈন্যভর্তি আগে পিছে দুটো ট্রাক, আর তারই মাঝে কাঁচের জানলা আটকানো কালো রঙের ঢাকা গাড়িতে স্বয়ং জজসাহেব ইউনি। বলা যায় না, নিছক নীল আকাশ থেকেও হয়তো আচম্‌কা গুলী গর্জে উঠবে সাদা মানুষটির বুকে।···আরও কত ঘটনা কত ছবিই না মনে পড়ে যায় সে সব দিনের কথা ভাবতে বসে!

কয়েক বছর পরে ময়মনসিংহের পরিচিত একজনের সঙ্গে দেখা হলো। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম বরুণাদির খবর।

'সেই মজার বিশ্রী খবরটাই শোননি? বরুণাদি তো বিয়ে করেছে।'

বাইরে প্রকাশ না পেলেও মনে মনে ভীষণ চমকে উঠেছিলাম।

'তা বিয়ের খবরটা 'মজার বিশ্রী' মানে?'

'মানে শুনলেই বুঝতে পারবে ;—বিয়ে করেছেন এক পাঞ্জাবী পুলিশ ইনসপেক্টরকে। বিয়ে করেই একেবারে উধাও। কতদিন কোন খোঁজই আমরা পাইনি, পুলিশও আর কোন খোঁজ নেবার দরকার মনে করেনি। এখন শুনছি নাকি কোন্ এক নেটিভ স্টেটে ওর স্বামী সুপার, আর তোমার অত সাধের বরুণাদি তাঁর ঘরণী—দিব্বি নাকি হলিউড্ মার্কা স্টার বনেছেন। ঠিক তেমনি করে চুল ছাঁটা, লাল ঠোঁট আর চূনকাম করা মুখ!'

আশ্চর্য। তারপরেই কিন্তু বরুণাদিকে আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। শুধু কলকাতাব চৌরঙ্গীতে আর তার আশপাশে যখন কোন বাঙালী মেয়েকে উগ্র সাজ করে নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখতাম, তখনই চট্ করে এক একবার বরুণাদির মুখটা মনের মধ্যে উঁকি মেরে যেত।

চাকরিজীবনে এই অনসূয়াকে দেখে বরুণাদির কথা আবার মনে পড়ে গিয়েছিল। চেহারা বা ব্যবহারে কোথাও মিল নেই। তবু কেন জানি একজনকে দেখলেই আরেকজনের কথা মনে পড়তো।

'ওর ঐ স্বভাবের জন্যই তো কোথাও টিকে থাকতে পারে না! তাই এম-এ পাস করে ইস্তক ছ'মাস এখানে, ছ'মাস ওখানে—এই করে বেড়াচ্ছে। কার এমন মাথাব্যথা পড়েছে যে, ওর ঐ কথার ঝাঁঝ সহ্য করবে? সবাই তো আর মণিকাদি নয়!'

মণিকাদির আশংকা মিথ্যে হলো না; কিছুদিন পরেই অনসূয়া অন্যত্র চাকরি নিয়ে চলে গেল। এবারে আর স্কুলে নয়, বিহারের এক কলেজে। সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ আর সমাজের অবজ্ঞেয় শ্রেণীর বাঁধন কাটিয়ে অনেক উঁচুতে উঠে গেল অনসূয়া, আমাদের অনেকেই সেদিন চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলাম।

ব্যক্তিত্ব আর গাম্ভীর্য দিয়ে সে নিজেকে গণ্ডীবদ্ধ করে রেখেছিল। আমাদের সকলের মাঝখানে সে ছিল একা; তাই যখন চলে গেল, তখন সে একাই গেল। মনে হয় এখানকার কোন স্মৃতিই সেদিন তাকে ক্ষণিকের জন্যও আনমনা করতে পারেনি।

দুটি বছর ঘুরে গেল। অনসূয়ার কথা যখন আমরা প্রায় ভুলে গিয়েছি, ঠিক সেই সময়েই হঠাৎ সে উপস্থিত হলো স্কুলে—

একেবারে মণিকাদির অফিস রুমে। ক্লাশে ছিলাম। মণিকাদি আমাকে ডেকে পাঠালেন। তাড়াতাড়ি নিচে গেলাম। দেখলাম অনসূয়া বসে আছে। একটু রোগা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু মুখখানা কেমন যেন কোমল, পেলব হয়ে উঠেছে। সেই দৃঢ় সংবদ্ধ ঠোঁট দুটিও আজ আর চুপ করে বসে নেই, মণিকাদির সঙ্গে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে।

এতদিন পরে দেখা, পুরনো সহকর্মিণীটিকে বড় ভালো লাগল। উচ্ছ্বাসভরে জড়িয়ে ধরলাম ওর হাত দুটি।

'এতদিন পরে হঠাৎ? কি ব্যাপার?' উৎসুক দৃষ্টিতে অনসূয়ার দিকে তাকালাম।

মণিকাদি একটু হেসে বললেন, 'এসব ব্যাপার হঠাৎ-ই হয়।' তারপর বিন্দুমাত্র ভূমিকা না করে বললেন, 'অনসূয়ার বিয়ে। ছেলেটি মুখুজ্জে, সুতরাং ইন্টার কাস্ট্, রেজেস্ট্রি করে বিয়ে হবে। তাই তোমাকে আমাকে সাক্ষী হবার জন্য অনুরোধ আর বিয়ের নিমন্ত্রণ—দুই-ই নিয়ে এসেছে। সুলতাও যাবে।'

অনসূয়ার বিয়ে! তাও আবার প্রেম করে! মানুষের জীবন সত্যিই গল্পের চাইতেও বিস্ময়কর; নইলে এমন অঘটন ঘটবে কেন?

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট অফিসে আমরা তিনজন যথারীতি উপস্থিত হলাম; এরপর আছে চৌরঙ্গীর এক রেস্টুরেন্টে চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ।

কৌতূহলের পাহাড় জমে উঠেছে মনে। কতক্ষণে দেখবো অনসূয়ার ভাবী স্বামীকে—কত বড় তিনি, যিনি অনসূয়ার ঐ কঠিন মনের তলায় উৎসের সন্ধান করতে পেরেছেন!

আমরা গিয়ে দেখি, অনসূয়া বসে আছে, আর বসে আছেন জনা পাঁচেক ভদ্রলোক। কৌতূহলে চোখ ফেটে আসতে চাইছে—কে? কোন্ জন?

'আসুন মণিকাদি, আলাপ করিয়ে দিই—শ্রীমণিকা রায়, এম-এ, বি-টি, হেড মিস্ট্রেস্, আর ইনি শ্রীরবীন্দ্রলাল মুখার্জী, আজকের থিয়েটারের নায়ক।'

হি-হি করে হেসে উঠলো অনসূয়া।

'আমরা এক সঙ্গে কাজ করেছি। ইনি মিস্ সুলতা ধর, আর ইনি মিস্...'

আমার কানে তখন কোন কিছুই ঢুকছিল না। যন্ত্র-চালিতের মতো হাত দুটি জোড় করে কোনমতে কপালে ঠেকালাম। মণিকাদি, সুলতাদির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ওঁদের মুখের ভাবও ঠিক স্বাভাবিক নেই, কেমন যেন হয়ে গিয়েছে।

এই অনসূয়ার স্বামী! কালো, রোগা, মাথায় বোধ করি অনসূয়ার চেয়ে একটু ছোটই। মুখে একটা ভীতি-বিহ্বল ভাব। কথা বলছেন অতি ধীরে, অস্ফুট স্বরে, তাও অনসূয়ার কথাতেই ঠেকা দিয়ে দিয়ে; হরিণ শিশুর মতো বড় বড় দুটি চোখ, শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন অনসূয়ার দিকে। নিজের থেকে একটা কথাও মুখফুটে বেরলো না ঐ ক্ষীণ কণ্ঠ থেকে।

বিয়ে হয়ে গেল, রেস্টুরেণ্টে গেলাম। চায়ের সঙ্গে প্রচুর আমিষ জাতীয় খাবারের ব্যবস্থা ছিল, অনসূয়াই অর্ডার দিলো, আমাদের অনুরোধ-উপরোধ করে খাওয়ালো, তারই মাঝে একবার ধমক দিয়ে উঠলো স্বামীকে, 'তুমি আবার চিকেনরোস্ট মুখে তুলছো? তুমি না বলো মুরগীর মাংস খেলে তোমার শরীর খারাপ হয়?'

সবে টেনে নেওয়া ডিস্‌টাকে তাড়াতাড়ি দূরে ঠেলে দিলেন অনসূয়ার স্বামী।

'আচ্ছা, একটুখানি খাও, অত ভালোবাসো যখন,—আজকের দিনে আর বাধা দেবো না।'—অনসূয়া একটু হেসে বললো।

অনসূয়ার স্বামী সামনের দিকে ঝুঁকে ডিস্‌খানা আবার টেনে নিলেন। মুখটা ক্ষণেকের জন্য উল্লসিত হয়ে উঠলো—অনেকটা হারানো লাল বলটি ফিরে পাওয়া ছোটছেলের মুখের মতো।

খাওয়ার পালা সাঙ্গ হলো। এবার বিদায়ের পালা। অনসূয়া দু'একদিনের মধ্যেই ফিরে যাচ্ছে নিজের কর্মস্থানে। ওর স্বামীও সেখানেই একটা অফিসে কাজ করেন। আসবার সময় ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে অনুরোধ জানালাম, কলকাতায় যখনি আসবেন আমাদের ওদিকে যেতে যেন তিনি ভুল না করেন।

উত্তরে তিনি কি বললেন, শুনতে পেলাম না।

ফিরতি বাসে উঠে বসলাম। এতক্ষণে তিনজন তিনজনের দিকে তাকালাম।

সুলতাদি ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'এত ঝাঁঝ, এত গর্ব, শেষটায় সব কিছু ঠেকলো এসে ঐ লোকটির পায়ে!'

আমিও চুপ করে থাকতে পারলাম না। বললাম, 'আমাদের দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু বিন্দুমাত্র কষ্ট নেই অনসূয়ার মনে! কী আশ্চর্য? কি করে ওর মতো মেয়ের এমন পছন্দ হয়?'

মণিকাদি এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবার বললেন, 'আমি কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছি তোমাদের দুঃখ দেখে। অনসূয়া ঠিকই করেছে। ও সত্যিই সুখী হবে, আর এখন থেকেই ওর জীবনে স্থিতি আসবে।'

একটু থেমে বললেন, 'তোমরা বুঝতে পারছো না, ও তাকেই ওর জীবনে মেনে নেবে, যে মাথা পেতে ওর কথা শুনবে, ওর প্রত্যেকটি কাজে সায় দেবে। অনসূয়ার ব্যক্তিত্বের কাছে ওর স্বামী পঙ্গু, অর্থহীন। ওর সেই মাথা উঁচু করে চলা, স্পষ্ট করে কথা বলা—সবই কায়মনোবাক্যে মেনে নেবে এই মানুষটি।'

আরও খানিকটা চুপ করে থেকে বললেন, 'অনসূয়া এবার শান্ত হবে, তোমরা দেখে নিও—অনসূয়া সম্পূর্ণ সুখী হবে।'

ভাবলাম, হবেও বা!
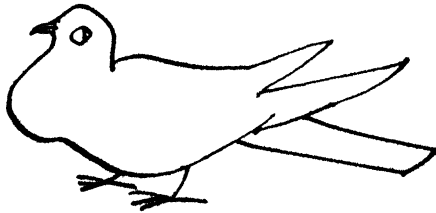
একটি উলের জামার পড়ে যাওয়া ঘরকে নিপুণ ক্ষিপ্রতায় আবার কাঠিতে তুলে নিয়ে দ্রুত বুনতে বুনতে সুনয়নীদি

বললেন, 'মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে সায়েবরাও কিন্তু যথেষ্ট করেছেন'—আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মিশনারী সায়েবদের একটা উদ্দেশ্যই তো ছিল আমাদের মেয়েদের মধ্যে ইংরিজী লেখাপড়া চালু করা। তাই তো তাঁদের স্ত্রীরা এগিয়ে এসেছিলেন, ঢুকলেন গিয়ে আমাদের অন্তঃপুরে '—

হেসে বললাম, 'আর তার আড়ালে যে 'মথিলিখিত সুসমাচার' ছিল, সেটা বুঝি মনে নেই ?'

'মনে আছে বৈকি,' সুনয়নীদি হেসে বললেন, 'কিন্তু তবু ভেবে দেখ্ মিস্ এ্যান কুক, মিসেস টমসন আর মিসেস হোয়াইট-এর কথা। শ্রীরামপুরের উইলিয়াম কেরী, জশুয়া মার্শম্যান, উইলিয়াম ওয়ার্ড, —অবিশ্যি এদিকেও ছিলেন কলকাতার রাধাকান্ত দেববাহাদুর, রাজা বৈদ্যনাথ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ……'

বাধা দিয়ে বললাম, 'সবার ওপরে কিন্তু বিদ্যাসাগর আর বেথুন।'

'ওঁদের নাম মুখে বলি না—জপ করি।'

তাকিয়ে দেখলাম শেলফের ওপরে দেওয়ালটিতে টাঙানো একটি ছবির দিকে। চিরপরিচিত ছবি ; পরনে ধুতি গায়ে চাদর, হাতে দু'খানা বই, স্বল্পকেশ মস্তক, তার নিচে অনমনীয় ললাট, দুটি তীক্ষ্ণ চোখ, পায়ে তালতলার চটি। চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে সেই চেহারা। উদ্ধত মদগর্বিত শ্বেতাঙ্গ নিজের চোখকে পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারছেন না। একটা নেটিভের এত বড় স্পর্ধা! তাঁর সামনে চটিশুদ্ধ পা দুটো টেবিলের উপর তুলে দিয়েছে! সায়েবের রাগ দেখে হেসে উঠেছিলেন বিদ্যাসাগর। সভ্যদেশের প্রতিনিধি সায়েবই তো আগে ঢিলটি ছুড়েছিলেন, তবেই না তিনি পাটকেলটি মেরেছিলেন!

প্রতিদিন টাটকা ফুল দিয়ে ঐ পা দুটিকে পুজো করতেন সুনয়নীদি। মেয়েদের পরিত্রাতা,—অবহেলিতা লাঞ্ছিতা মেয়েদের পথের দিশারী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে সুনয়নীদি বলতেন হিন্দু ফিমেল স্কুলের কাহিনী।

জন ড্রিংক্ওয়াটার বীট্ন—এদেশে হলেন বেথুন—বেথুন সায়েব। কেমব্রিজের র‍্যাংলার, আইনশাস্ত্রে পণ্ডিত। গভর্নর জেনারেলের ব্যবস্থাসচিব হয়ে এলেন এদেশে। বাংলার কালো এঁটেল মাটি জড়িয়ে গেল খাঁটি বিলিতি সায়েবটির পায়ে। সায়েব জড়িয়ে পড়লেন কালো মানুষগুলির মায়ার বাঁধনে। গাঢ় প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হলেন বিদ্যাসাগর ও বেথুন—কালো আর সাদা—পুব আর পশ্চিম। বেথুন সায়েব প্রাণের অধিক ভালোবাসতেন নিজের মাকে, এবার ভালোবাসলেন এদেশের শ্যামলী মেয়েগুলিকে। অকাতরে অর্থ ব্যয় করে, অসীম ধৈর্য আর অটুট পরিশ্রম দিয়ে তৈরি করলেন হিন্দু ফিমেল স্কুল। স্কুলের প্রথম সম্পাদক হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রথম ছাত্রী মদনমোহন তর্কালংকারের দুটি কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালা। কিছুদিন পরে ভর্তি হলেন আর একটি মেয়ে, নাম সৌদামিনী দেবী—পিতা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুনয়নীদি প্রায়ই বলতেন, 'ডিজ্‌রেলী আর গ্ল্যাডস্টোনের ইতিহাস পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে মেয়েদের কাছে বেথুন সায়েবের গল্পও একটু করে বলিস, রোজ সকালে ঐ নামটি স্মরণ করলে মেয়েদের পুণ্যি হবে রে।'

মনে পড়ে সেই ঝড়-জলের দিনটি। বেথুন সায়েব হেঁটে চলেছেন জনাই গ্রামের দিকে। অশ্রান্ত বৃষ্টির অঝোর ধারায় সমস্ত শরীর ভিজে গিয়েছে, পথের কাদায় পা দুটো বারবার ডুবে যাচ্ছে। ঝড়ের প্রচণ্ড হাওয়া ঠেলে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে সায়েবকে। কিন্তু তিনি অটল, তাঁকে যে যেতেই হবে। জনাইয়ের অধিবাসীরা আগ্রহে অপেক্ষা করছে কখন তিনি তাদের গ্রামের স্কুলটিতে এসে পায়ের ধুলো দেবেন। বেথুন সায়েব ঝড়-জল অগ্রাহ্য করে শেষ পর্যন্ত জনাইয়ে হাজির হলেন। সবাই অবাক! এই ঝড়-জলের মধ্যেও সায়েব এলেন কি করে? সায়েব হেসে বললেন, 'বারে, কথা দিয়েছি যে,' তারপর সেই ভিজে জামাকাপড় পরেই সায়েব ইস্কুল দেখলেন। চোখ দুটো আনন্দে যেন জ্বল জ্বল করে উঠল,—ইস্কুল যে। তাঁর ভালোবাসার দেশের ছেলেরা পড়বে এখানে, মানুষ হবে। বললেন, 'কি যে খুশি হলাম তোমাদের ইস্কুল দেখে।'

ইস্কুল যারা তৈরি করেছেন তাঁরাও সায়েবকে দেখে খুশি। কিন্তু হাসিখুশির পালা এখানেই শেষ হলো। কলকাতায় ফিরে জ্বরে শয্যাশায়ী হলেন জন ড্রিংকওয়াটার বেথুন। তারপর একদিন চোখ মুছতে মুছতে কলকাতার লোকেরা বঙ্গজননীর কোলে তাঁর এক কুড়িয়ে পাওয়া সন্তানকে চিরনিদ্রায় শায়িত করলে। অনেকেই কেঁদেছিল সেদিন। বীরসিংহের সিংহশিশু বিদ্যাসাগরও প্রিয় বন্ধুকে হারিয়ে নিজেকে সংযত রাখতে পারেননি। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলেন বালকের মতো। অস্থির হয়ে রাত্রির অন্ধকারে কতদিন জেগে বসে থাকতেন, আর ভাবতেন তাঁর ডানহাতখানা এত অসাড় হয়ে পড়েছে কেন?

হিন্দু ফিমেল স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন-উৎসবে বেথুন সায়েব বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "I will build upon this spot a school for the education of Hindu Girls, which with the blessings of God, I trust, may be destined hereafter to produce effects worthily entitling to have a name in the annals of the land."

সেই হিন্দু ফিমেল স্কুল, বেথুন স্কুল আর বেথুন কলেজে রূপান্তরিত হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে। লোকে বলে আত্মা অবিনশ্বর, তাই বিশ্বাস করতে বাধা নেই যে, মহাকালের ওপার থেকে বেথুন সায়েবের আত্মা পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করেছে কয়েক বছর আগে অনুষ্ঠিত বেথুন বিদ্যায়তনের শতবার্ষিকী উৎসবে।

আমাদের রুক্ষতার মাঝে স্নিগ্ধতার প্রতিমূর্তি ছিলেন কাজলদি। যেদিন তিনি মণিকাদির সঙ্গে আমাদের কোয়ার্টার্সে প্রথম এলেন, আমরা ভেবেছিলাম বুঝি কোন বিশিষ্ট মহিলা, মণিকাদির বন্ধু কিংবা আত্মীয়া। কালো রঙের বিরাট গাড়ি, তার পাগড়ি বাঁধা পাঞ্জাবী ড্রাইভার, পাশে কোমরে ভোজালী নিয়ে নেপালী

দরোয়ান। তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজা খুলে দিতেই নেমে এলেন মণিকাদি আর কাজলদি। মহানগরী থেকে 'বাসে' বা 'ট্রামে' এসে নির্দিষ্ট স্টপেজে নেমে বাকী পথটুকু রিক্সায় চড়ে ঠুন্ ঠুন্ করে কোয়ার্টার্সের দোর-গোড়ায় নেমে পড়া—এই-ই হলো আমাদের, শিক্ষয়িত্রীদের আসাযাওয়ার স্বাভাবিক পথ বা উপায়। সেই দরজায় যিনি চমক-লাগানো প্রকাণ্ড গাড়ি করে উপস্থিত হন, তিনি আর যাই হোন, 'দিদিমণি' নন। আসলে কিন্তু চমকে উঠলাম যখন শুনলাম, মণিকাদি বলেছেন, 'এই নাও, তোমাদের আরেকজন বাড়লো। তোমাদের সঙ্গে কাজ করবেন, তোমাদের কোয়ার্টার্সেই থাকবেন। আশা করি এঁর সুখসুবিধা তোমরা একটু দেখবে।'

এতবড় গাড়িতে দিদিমণি! আরও আশ্চর্য লাগল, মণিকাদির কণ্ঠেও এই নবাগতা মহিলাটি সম্বন্ধে সম্ভ্রমের সুর লক্ষ্য করে। নাম শুনলাম কাজললতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মিনিট দশ-পনেরোর মধ্যেই তিনি হয়ে গেলেন আমাদের সকলের কাজলদি।

কাজলদির বয়স বছর পঁয়ত্রিশ, গায়ের রং ফরসার ধার ঘেঁসে গিয়েছে মাত্র। শত্রুপক্ষ বলবে কালো; উত্তম শ্যামবর্ণ বলবে আপন-জন। কিন্তু সকল সমালোচনার বাইরে ছিল কাজলদির নিখুঁত মুখশ্রী। দীর্ঘপ্রসারিত দুটি স্বচ্ছ চোখ, বঙ্কিম ভ্রূ দুটি ওপর দিকে ঈষৎ টেনে তাকাতেন। সুগঠিত মানানসই নাকের নিচে বাঁকা রেখায় আঁকা পাতলা দুটি ঠোঁট। তার মধ্যে মুক্তোর সারিতে যখন মিষ্টি হাসির ঝিলিক খেলে যেত, তখন শুধু মুগ্ধ হয়ে বলতাম, 'সত্যি কাজলদি, আপনি কত সুন্দর!' স্নিগ্ধ শ্রীতে কাজলদি আরও সুন্দর হয়ে উঠতেন।

কালো পাড়ওয়ালা তাঁতের শাড়ি, মণিবন্ধে দু'তিন গাছা করে সোনার চুড়ি, গলায় একটি সরু সোনার হার। তবু মাথার ঘন কালো চুলের মাঝখানে সাদা সিঁথিটির দিকে তাকিয়েই স্পষ্ট বুঝেছিলাম, ওখানে একদিন যে শুভ চিহ্নটি ছিল, আজ তা নেই—তাই দেহের আভরণ থাকা সত্ত্বেও ঐ সিঁথির নিরাভরণতাই যেন বড় বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে। আমরা মনে মনে সেদিন বলেছিলাম, অমন চেহারা, এমন লক্ষ্মীশ্রী, তার অদৃষ্টে এ কী সর্বনাশ!

অতি অল্পদিনে গভীর স্নেহে আমাদের সকলকে কাছে টেনে কোয়ার্টার্স-জীবনকে সংসারের শ্রী-সৌন্দর্যে ভরিয়ে তুলেছিলেন কাজলদি। সকালবেলাতেই দেখা যেত সদ্য-স্নাতা কাজলদি তরকারির ঝুড়িটি টেনে নিয়ে বসেছেন কুট্‌নো গুছোবার জন্য। রান্নার পর প্রত্যেকের বাটিতে, ডিসে সাজিয়ে দিচ্ছেন পরিমাণ মতো মাছের ঝোল, তরকারি, চচ্চড়ি। কে কোন্‌ জিনিষটি বেশি ভালোবাসে বা পছন্দ করে—সব ছিল তাঁর নখদর্পণে। মাছের মুড়োটি পালা করে পাত বদলাতে লাগল, ঐ সামান্য ডাল-চচ্চড়িই তখন অন্য স্বাদ ধারণ করে আমাদের জিহ্বা রসায়িত করে তুললো। খাওয়ার সময়ে আর রইলো না কারও কোন অভিযোগ বা অভিমান। কাজলদি জড়িয়ে গেলেন আমাদের প্রত্যেকের জীবনের প্রতিটি সুখদুঃখের সঙ্গে।

ঐশ্বর্যের মাঝে পাঁচ ভাইয়ের পর জন্ম হয়েছিল বহু আকাংক্ষিত ছোট্ট খুকুর। দিন গড়িয়ে মাস আসে, ভাইয়েরা আদরে আদরে কাঁদিয়ে দেয় বোনটিকে—আবার অনুযোগ করে বলে, 'এ কেমনতরো বোন? কালো, ফরসা নয়!'

গৌরবর্ণ ভাইদের কাছে শ্যামা শিশুটিকে আরও মলিন দেখায়। মা হেসে বলেন, 'তা হোক কালো, ওই-ই আমার আলো, ওর নাম রাখলাম কাজল, আমার কাজললতা'—মা শিশুটিকে বুকে চেপে ধরেন।

এমনি করেই মা-বাবার আদর আর পাঁচ ভাইয়ের স্নেহের মাঝে বড় হয়ে ওঠে কাজললতা।—যে মাঘ মাসে ষোল বছর পূর্ণ হলো, ঠিক তার পরের ফাল্গুনেই এক শুভদিনে জীবনের পরমলগ্নে কাজলদির গলায় মালা দিয়ে তাঁকে অন্তরতমা করে কাছে টেনে নিলেন এক সৌম্যকান্তি যুবক। বৌদি-বন্ধুদের আকুল অনুরোধে চন্দনচর্চিত মুখখানা তুলে ধরে কাজলদি সামনের দিকে তাকিয়েছিলেন, দেখেছিলেন এক মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টি—সে দৃষ্টি পরম সুন্দরের, পরম আত্মীয়ের। সেদিন কাজলদির রক্ত-কণিকায় রণরণিয়ে উঠেছিল এক বিচিত্র অনুভূতি, উচ্ছল ঝরণার মতোই বয়ে গিয়েছিল তারপরের সাতটি বছর।······

বেলা পড়ে আসছে। সূর্যদেব পশ্চিম আকাশের গায় অনেকখানি হেলে পড়েছেন। আজ নববর্ষ। স্কুল ছুটি। সকাল থেকেই ব্যতিক্রম দেখা গেল কাজলদির দৈনন্দিন রুটিনে। কোন্ ভোরে উঠে স্নান করেছেন, তারপর অজস্র ফুল দিয়ে সাজিয়েছেন শেল্‌ফের ওপরে ফটো-ফ্রেমে আটকানো স্বামীর ছবিটিকে ; অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছেন চিরচেনা হারিয়ে যাওয়া মানুষটিকে—ঠোঁটের কোণে হাসিটি ঠিক তেমনিভাবেই ফুটে উঠেছে, এক্ষুণি যেন ডাক দেবেন—"কাজল, কাজলরাণী···" ছবিটা ক্রমে ঝাপ্‌সা হয়ে এল, কাজলদির সুন্দর দুটি চোখ জলে ভরে উঠেছে।

'মনে হয় সবই বুঝি মিথ্যে···একটা দুঃস্বপ্ন।'

ক্লিষ্ট, ক্লান্তকণ্ঠে বললেন কাজলদি, 'এই তো মাত্র সেদিনের কথা—এরই মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল!'

কাজলদির খোলা চুলগুলি ধীরে ধীরে টেনে দিতে লাগলুম, বলতে পারলাম না কিছুই, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। কেন জানি আলো জ্বালাতে ইচ্ছে করলো না।

কাজলদি আজ উপবাসী। তাঁর স্বামীর আজ মৃত্যুদিন। কয়েক বছর আগে বছরের এই প্রথমদিনটি ঘূর্ণি হাওয়া বয়ে এনেছিল কাজলদির জীবনে, ভেঙে দিয়েছিল তাঁর স্বপ্ন আর বাসনা।

বিয়ের পরদিন শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার সময় অশ্রুমুখী কাজলদিকে মা-দাদাদের বুক থেকে টেনে তুলতে আত্মীয়স্বজনকে অনেক সাধ্যসাধনা করতে হয়েছিল। কোন উপায় নেই, মেয়ে হয়ে জন্মানো মানেই পরের ঘরের জন্য তৈরি হওয়া। গাড়িতে উঠেও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছিলেন কাজলদি। অপরিচিত সুন্দর পুরুষটি তাঁকে সেদিন বলেছিলেন, 'এত ভয়, এত কান্না কেন? আমি তো আছি।'

ফুলশয্যার রাতে দুটি আবেগ-মথিত বাহু-বন্ধনে বন্দী হয়ে উষ্ণ প্রশস্ত বক্ষে মাথা রেখে পরম নির্ভয়ে কাজলদি মনে মনে উচ্চারণ করেছিলেন, 'সত্যিই, তুমি তো আছ!'

রেলওয়ে ওয়ার্কশপের পদস্থ অফিসার ছিলেন কাজলদির

স্বামী। সম্ভ্রান্ত পল্লীতে, সম্পন্ন ফ্ল্যাট, তাতে অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত সংসার। সংসার নয়, ছবি।

'নিজে হাতে করে কিনে এনেছিলেন দামী গোলাপের কলম, রকমারি ক্রোটন, ক্যালেণ্ডুলা, ফার্ন—আরও কত দিশি বিলিতি ফুলের গাছ। দক্ষিণ আর পুবদিকের ঝোলানো বারান্দায় সার করে বসিয়েছিলেন লাল রং করা মাটির টব। বারান্দার এক পাশের রেলিং দিয়ে বেয়ে উঠেছিল ওঁরই হাতে লাগানো একটা লতানো জুঁই। দুটি বেতের চেয়ারে মুখোমুখি হয়ে বসে থাকতাম কতদিন, কতরাত। কখনও গল্প করতাম, কখনও বা তারও দরকার হতো না।'

কাজলদি বালিশে মুখ গুঁজে রইলেন অনেকক্ষণ। সর্বহারা কাজলদি। কী সান্ত্বনাই বা আমি তাঁকে দেবো!

কাজলদির এই অশ্রুমুখী চেহারা আর ঘরের জমাট অন্ধকার কেমন যেন বুক চেপে ধরে। তাড়াতাড়ি লাইট জ্বালিয়ে দিই। চমকে উঠে বসেন কাজলদি। উপবাস-ক্লিষ্ট শ্রান্তচেহারায় অদ্ভুত এক হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'মাঝে মাঝে মনে হয়—ও এক্ষুণি এল বলে, এই তো খানিকটা আগে অফিসে গেল···'

সেদিন। রাত্রি শেষ হয়ে আসছে, পুব আকাশের গায়ে অস্পষ্ট স্বচ্ছতার আলো ফুটে উঠছে, শুকতারাটি জ্বল্‌জ্বল্ করে এক নাগাড়ে জ্বলছে। কাজলদির ঘুম ভেঙে গেল, পাশ ফিরে স্বামীকে ডাকতে গিয়েও থেমে গেলেন, খোলা জানলা দিয়ে আবছা আলো এসে পড়েছে ঘুমে অচেতন স্বামীর মুখখানাতে। এক গোছা চুলে ঢেকে গিয়েছে কপালের খানিকটা। গভীর মমতায় কাজলদি চুলের গোছাটি সরিয়ে দিলেন, অকারণ হাত বুলোলেন মাথায়, পিঠে, বুকে। স্বামীকে ডেকে দেবার কথা আছে খুব ভোরে। জরুরী কাজে সাতটার মধ্যেই বাড়ি থেকে বেরুতে হবে। ডেকে দেবার আগে আরেকবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন কাজলদি, বড় ভালো লাগছে, বড় সুন্দর। বুকের কাছে হাত জোড় করে চোখ বুজে কাজলদি মনে মনে বললেন, 'ঠাকুর, আমার এই ঐশ্বর্যে যেন কোন দুঃখবিপদের ছোঁয়াচ না লাগে—'

চা খাওয়ার পর স্বামীর হাতে সব গুছিয়ে দিয়ে কাজলদি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কখন আসবে তুমি?'

স্ত্রীর চিবুকটা নেড়ে দিয়ে স্বামী বলেছিলেন, 'বেশি দেরি হবে না, বারোটার মধ্যেই ফিরবো। ফেরার আগে আমার কাজুরাণীর কাছে টুক্ করে একটা ফোন করে দেবো'খন'—মুখখানি আরেকবার নেড়ে দিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে চলে গেলেন কাজলদির স্বামী।

'আজও স্পষ্ট শুনতে পাই সেই চলে যাওয়ার জুতোর শব্দ—আস্তে আস্তে সিঁড়ির গায়ে মিলিয়ে গেল…'

বারোটা বেজে চল্লিশ। এর নাম বারোটার মধ্যে ফেরা! ভ্রু কুঁচকে কাজলদি বারান্দা দিয়ে ঝুঁকে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। আদর করে আবার বলা হলো ফোন করবেন! বয়ে গিয়েছে! পুরুষমানুষ কিনা, কেবল নিজের স্বার্থটাই চেনে!

কিন্তু এত দেরি হচ্ছে কেন? অজানা আশঙ্কায় মুখ কালো হয়ে উঠলো কাজলদির।

'খবর পেলাম চারটের পরে। আচম্কা বাড়ি ভর্তি হয়ে গেল অজানা অচেনা লোকে। দাদারা ছুটে এলেন মাকে নিয়ে; সবার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হয়েছে? তোমরা এখানে কেন?' কেউ উত্তর দিলে না, আমাকে জোর করে গাড়িতে ওঠালো। যত বলছি, ছেড়ে দাও, ও এক্ষুণি ক্ষিধের মুখে আসবে, আমি বসে না থাকলে ওর খাওয়া হয় না—ততই মা-ভাইরা আমাকে আঁকড়ে ধরলেন। কোথায় যে আমাকে নিয়ে এল, জানি না। সামনে বিছানো সাদা চাদরটা উঠিয়ে নিতেই দেখলাম…প্রথমে চিনতে পারিনি, তারপর চোখে পড়লো ক্ষতবিক্ষত মুচ্‌ড়ে দুম্‌ড়ে যাওয়া বাঁ হাতের একটা আঙুলে বিয়ের হীরের আংটিটি, সমস্ত শরীরে একটিমাত্র অক্ষত জিনিষ, কতবার আমার আঙুলে পরিয়ে দিয়েছে, আবার আমি পরিয়ে দিয়েছি ওর আঙুলে।

'সামনে দাঁড়িয়ে কে একজন যেন আমাকে কি জিজ্ঞেস করলো—উত্তর দেবার আগেই পড়ে গেলাম। একটা চট্‌চটে জিনিষে চোখ দুটো ঢেকে গেল······

কাজলদির স্বামীর মৃত্যু হয়েছিল দুর্ঘটনায়, গাড়ি আর লরির সংঘর্ষের মাঝখানে তিনি ছিট্‌কে পড়েছিলেন, নিষ্পেষিত হয়েছিল তাঁর প্রতিটি অস্থি।

স্বামীর নিদারুণ মৃত্যু কাজলদি সহ্য করতে পারেননি। স্বামীর ক্ষতবিক্ষত বুকে সেই যে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন, চোখ মেলে তাকিয়েছিলেন চারদিন পরে। বিছানা-ঘিরে থাকা মা-ভাইদের আকুল দৃষ্টি প্রথমটা শাস্ত হয়ে এলেও কিছুক্ষণ পরেই তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, ডাক্তারের আশঙ্কাই সত্যি হয়েছে। আগেকার সুস্থ স্বাভাবিক কাজললতা আর নেই, সে এখন অস্বাভাবিক, উন্মাদ।

চোখ মেলেই কাজলদি উঠে বসতে গেলেন; মা এসে তাড়াতাড়ি ধরলেন। কাজলদি চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'আমাকে ধরে রেখেছ কেন? ছেড়ে দাও—ও যে এক্ষুণি আসবে; ক্ষিধের মুখ, আমি বসে না খাওয়ালে ওর খাওয়া হয় না'—মা ছুটে চলে গেলেন পাশের ঠাকুরঘরে, মাথা ঠুকতে লাগলেন সাদা পাথরের মেঝেতে। ভাইরা বোনটিকে ধরে রাখলেন জোর করে।

'এত বেলা হলো, ও এখনও বাড়ি ফিরছে না কেন?' প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বারবার একই প্রশ্ন করে যান কাজলদি। বারান্দা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে চেয়ে দেখেন রাস্তায় যতখানি দৃষ্টি যায়। টেলিফোন বেজে উঠলেই হাসিমুখে ছুটে যান টেলিফোনের কাছে—বৌদিরা গিয়ে হাত চেপে ধরে।

এর পর কাজলদি খুঁজতে বেরোলেন তাঁর স্বামীকে। ডাক্তারের পরামর্শে স্নেহময় দাদা একখানা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে দিলেন, সঙ্গে দিলেন ঝি আর দরোয়ান। দুর্ভাগা

ছোটবোনটি যদিই-বা একটু সান্ত্বনা পায়। প্রতিদিন সকালবেলায় কাজলদি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন। মন্থরগতি ঘোড়ার গাড়িতে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন এ রাস্তা থেকে ও রাস্তা, চৌরঙ্গী থেকে শ্যামবাজার, ভবানীপুর থেকে বালিগঞ্জ। কোথায় স্বামী লুকিয়ে আছে···এতক্ষণ না দেখে থাকা যায়? সেই কোন্ সকালে বেরিয়ে গিয়েছে···কত বেলা হলো···।

ঝি, দরোয়ান বিরক্ত হয়, গাড়ির গাড়োয়ান এমন মজার সওয়ারী পেয়ে চটুল গানের সুর ভাঁজে।

বেলা গড়িয়ে আসে। ক্লান্ত হতাশমুখে ফিরে আসেন কাজলদি, 'আজকেও ওকে পেলাম না···মা, কোথায় যে গেল···।' মা তাড়াতাড়ি বুকে টেনে নেন, মেয়ের দৃষ্টির আড়ালে চোখ মুছে বলেন, 'হতভাগী'।

এই পরিক্রমার একদিন শেষ হলো—আচম্‌কাভাবেই হলো। কাজলদি যাচ্ছিলেন হ্যারিসন রোড ধরে। বেলা প্রায় দশটা। গাড়ি হঠাৎ থেমে গেল, থেমে গেল অন্য গাড়িগুলোও। মুহূর্তে লোকের ভিড় জমে উঠলো রাস্তার মাঝখানে। কাজলদি ঝিকে জিজ্ঞেস করে কোন সদুত্তর না পেয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালেন জানলা দিয়ে। লোকের ভিড়ে দেখা যাচ্ছে না কিছুই; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে পুলিশ এসে পড়ায় ভিড় খানিকটা সরে গেল, আর সেই ফাঁক দিয়ে কাজলদি দেখলেন রাস্তার ওপরে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটি পুরুষের দেহ, মাথাটা থেঁতলে দিয়ে গাড়ির চাকা চলে গিয়েছে। রাস্তার ধুলো রক্তের সঙ্গে মিশে জমাট বেঁধে উঠেছে···

···এরপর কাজলদি চোখ খুললেন প্রায় একদিন পরে, মায়ের কোলে—নিজের বিছানায়। রাস্তার দুর্ঘটনা দেখে ঘোড়ার গাড়ির গদির ওপরেই লুটিয়ে পড়েছিলেন। কাজলদি মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বহুক্ষণ ধরে দেখলেন মা, দাদা আর বৌদিদের। তারপর বুকচেরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চোখ বুজে রইলেন—চোখের দু'কোণ দিয়ে অঝোরে ঝরে পড়তে লাগল এতদিনের রুদ্ধ কান্নার স্রোত···।

ডাক্তারবাবু বাইরে এসে বললেন, 'ভয় নেই, এবার উনি সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাবেন।'

এর পর আর ঘোড়ার গাড়ির দরকার হয়নি, কাজলদির নিষ্ফল পরিক্রমার এইখানেই শেষ হয়েছিল।

. এই ঘটনার পর থেকে আমাদের স্কুলে যোগদান করা পর্যন্ত—এর মাঝখানে কাজলদির জীবনের অনেক ক'টি বছর কেটে গিয়েছিল। আমাদের স্কুলে যখন এলেন তখন তিনি তাঁর মানসিক সুস্থতা সম্পূর্ণই ফিরে পেয়েছেন। শুধু অবাক লাগতো যখন আচম্‌কা তিনি আমাদের প্রশ্ন করতেন, 'হ্যাঁ রে, মুখ শুকনো কেন রে, ক্ষিধে পেয়েছে ?'

শুধু আমাদেরই নয়, স্কুলের মেয়েদের মধ্যেও কারো শীর্ণমুখ দেখলে কাছে টেনে নিতেন, জেনে নিতেন তার ক্ষিধে পেয়েছে কিনা ; আর তারপরেই তার খাওয়ার ব্যবস্থার জন্য পয়সা বার করে দিতেন নিজের ব্যাগ থেকে। শুধু একজন নয়, এমনি করে প্রায় প্রতিদিনই অন্ততঃ পাঁচ-ছ'টি মেয়েকে তিনি টিফিনের সময় কিনে দিতেন রকমারি খাবার।

মণিকাদি বলেছেন, আমরাও কত বলেছি·· 'কেন মিছিমিছি এরকম খরচ করেন কাজলদি, কত মেয়ের ক্ষিধে আপনি মেটাবেন ?'

কাজলদি শুধু উত্তর দিতেন, 'কি জানি, কারো ক্ষিধের মুখ দেখলে কেন জানি থাকতে পারি না।' কাজলদির গলার স্বরটা আস্তে আস্তে মৃদু হয়ে আসতো।

আজও মনে পড়ে কাজলদির প্রসন্ন মাতৃত্বে ভরা বেদনাবিধুর মুখখানা—কাজলদিকে কখনও ভুলবো না।

পৃথিবীর প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের পেছনে রয়েছে কয়েকটি বিশিষ্ট মস্তিষ্কের পরিচালনা, বুদ্ধি ও দৃষ্টি। যুদ্ধ, শান্তি, বাণিজ্য, শিক্ষা, শাসনব্যবস্থা, এমন কি তেমন কোন কারণ থাকলে দুর্ভিক্ষ, দুর্ঘটনা পর্যন্ত—সব কিছুরই মূলে আগে চিন্তা, পরে কাজ। চিন্তা শক্তি একক নয়, মিলিত। এমনিধারা মিলিত. শক্তি

পরিচালনা করে আমাদের চারুসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়কে। স্কুলের সুখদুঃখ, উন্নতি-অবনতি, দায়-দায়িত্ব—সব কিছুর ভার রয়েছে এই পরিচালক সমিতি বা গভর্নিং বডির ওপর।

এই পরিচালক সমিতিতে যাঁদের সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়, তাঁদের মধ্যে থাকেন ডাক্তার, শিক্ষাকার্যে আগ্রহশীল এবং উৎসাহী ব্যক্তি, অর্থদাতা, ছাত্রীদের অভিভাবক এবং দু'জন শিক্ষয়িত্রী-প্রতিনিধি। কোন কোন ক্ষেত্রে থাকেন ফাউণ্ডার মেম্বার অর্থাৎ যিনি স্কুল স্থাপন করেছেন কিংবা এই কাজে বহু সাহায্য করেছেন। হেডমিস্ট্রেস তো পদাধিকার বলে আছেনই।

আজকের দিনে গণতান্ত্রিক পন্থায় ভোটের বলে সদস্য নির্বাচিত হন। এই ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ নির্বাচন-কালে যে উত্তেজনা আর প্যাঁচের খেলা দেখা যায়, তার উত্তাপ রাজনৈতিক নির্বাচনের চেয়ে কম নয়।

নির্বাচনের পর কমিটী তৈরি হয়, তখন নিযুক্ত হন সভাপতি, সহ-সভাপতি আর সম্পাদক।

সাধারণ নিয়মে প্রথমোক্ত দুটি পদ লাভ করেন তাঁরাই, যাঁরা গণ্যমান্য বলে বিবেচিত, স্থানীয় সমাজ যাঁদের শক্তি ও প্রভাবকে যথেষ্ট স্বীকৃতি দিয়ে থাকে।

নীতি অনুযায়ী সম্পাদক হবার কথা তাঁরই, যিনি শিক্ষাবিদ্, যিনি প্রকৃতই শিক্ষার মর্ম ও মূল্য বুঝতে সক্ষম, উপরন্তু দায়িত্ব-জ্ঞান-সম্পন্ন; কেননা বাইরের দিক থেকে তিনিই হলেন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আসল কর্ণধার। সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত অফিস আর স্কুল, এ-দু'-এর ভায়ামিডিয়া সম্পাদক। স্কুলের বৈদেশিক নীতি চালনা করেন তিনি, এদিক থেকে তিনি হলেন স্কুলের ফরেন মিনিস্টার। কর্তব্য তাঁর বড় কম নয়। স্কুলের রাজনীতি, অর্থনীতি—মায় আভ্যন্তরীণ নীতিরও কিছু কিছু তাঁকেই দেখতে হয়। বর্তমানে অবশ্য হেডমিস্ট্রেসের এক্তিয়ারের মধ্যেই প্রায় সব কিছু অধিকার পড়ে গিয়েছে। আজকের দিনে সম্পাদকের গুরু দায়িত্বের অনেকখানি অংশ নিয়েছেন হেডমিস্ট্রেস নিজে। তাঁর হোম-পলিসিতে অহেতুক মাথা গলাবার কিছুমাত্র অধিকার নেই সম্পাদকের—স্কুলের অভ্যন্তরে হেডমিস্ট্রেস একেশ্বরী।

স্কুল-কমিটীতে শিক্ষয়িত্রী-প্রতিনিধি হয়ে নির্বাচিত হয়েছিলাম। সুযোগ আর সৌভাগ্য হয়েছিল কর্মজীবনের প্রবহমান স্রোতটির মূল উৎসটিকে দেখবার।

গোটা তিনেক এ্যাজেণ্ডা বা প্রস্তাব মিটিং-এর আলোচনার বিষয়বস্তু, আর থাকে মিস্‌লেনিয়াস্‌ বা বিবিধ—যার মধ্যে কোন ছাত্রীর কয়েক মাস মাইনে বাকি থাকার দরুন উদ্ভূত সমস্যা থেকে আরম্ভ করে দূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক কোলাহলের আলোচনা পর্যন্ত—সব কিছুরই স্থান হয়। সাধারণতঃ মিটিং যখন সমাপ্তির পথে, তখনই 'বিবিধ' আলোচিত হয়।

সকাল থেকে জ্যোৎস্নাদি সমানে বলে যাচ্ছেন, 'বলতে ভুলে যাসনে কিন্তু, আমাব মাইনেটা মালতি দাসের চাইতে পাঁচটাকা কম কেন? সমান কোয়ালিফিকেশন, একই বছরে, একই মাসে দু'জনে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট পেয়েছি—তবে এমন হবে কেন? সব কিছু এনকোয়ারী কবে দেখবি, বুঝলি?'

মাথা নেড়ে ছাডা পেলাম।

টিফিনের সময় মালতি দাস বললেন, 'আজকে তো আপনাদেব মিটিং। আমাদের ডি-এ'র কথাটা বলতে ভুলবেন না। অন্য সব স্কুলে দশটাকা, পনেবোটাকা—আর আমাদের স্কুলে মাত্র পাঁচ! এ সব কথা বলবার জন্যেই তো আপনাদের ভোট দিয়ে পাঠিয়েছি।'

সে তো বটেই। মাথা নেড়ে এবার নিচে পালাই। সিঁড়িব শেষে মিসেস চৌধুবীর সঙ্গে একেবাবে মুখোমুখি। তিনি মনে করিয়ে দিলেন, তিনি না হয় বিনা দরখাস্তে কয়েকদিন অনুপস্থিত ছিলেন, তাই বলে একজন স্থায়ী শিক্ষয়িত্রীর একেবারে মাইনে কেটে নেওয়া!

'আমি ক'দিন আগেই কমিটীর বিবেচনার জন্য দরখাস্ত পাঠিয়েছি। আপনি একটু ফাইট করবেন আমার হয়ে। উনি তো যা বলবেন, বোঝাই যাচ্ছে—'

খানিকটা ব্যবধানে যাচ্ছিলেন সুলতাদি। মিসেস চৌধুরীর শেষ কথাটি তাঁর উদ্দেশে। সুলতাদি অন্যতমা শিক্ষয়িত্রী-প্রতিনিধি।

টিফিনের ঘণ্টা শেষ হয়ে গিয়েছে। ক্লাশ করছি। একটা চিরকুট হাতে এসে দাঁড়ালো আমাদের সিন্ধু দাসী। মণিকাদি একবার ডেকে পাঠিয়েছেন নিচে, তাঁর অফিস-রুমে। মেয়েদের লেখার কাজ দিয়ে মণিকাদির ঘরে ঢুকলাম। দেখলাম সুলতাদিও আছেন।

মণিকাদি একগাল হেসে অভ্যর্থনা জানালেন, 'বোস, তোমাদের সঙ্গে একটু জরুরী কথা আছে। এখন এদিকটায় কেউ আসবে না বলেই তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছি। ব্যাপারটা একটু গোপনীয়।'

কন্‌ফিডেন্‌সিয়াল! আমার সঙ্গে! একটু নড়েচড়ে বসলাম।

সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওদিকে বসেছিলেন মণিকাদি। আমাদের দিকে খানিকটা ঝুঁকে একটু চাপা গলায় বললেন, 'তোমরা তো জানোই ভাই, আমাকে স্কুল দেয় মাত্র দেড়শ' টাকা—তাও হয়েছে দু'বছর আগে। আমার মাকে নিয়ে আমি আছি। ফ্রি কোয়ার্টার্সের সুবিধে আমি কিছুই পাই না, কিন্তু পঁয়ত্রিশ টাকা দিয়ে তো আমাকে বাড়ি ভাড়া করে থাকতে হচ্ছে! স্কুলের কি উচিত নয় আমাকে হাউস এ্যালাওয়েন্স বাবদ কিছু দেওয়া?'

'সে তো একশ'বার, হাজারবার'—মাথা ঝাঁকিয়ে, কপাল কুঁচকে সুলতাদি বারবার বলতে লাগলেন।

'তুমি কি বলো?' আমার দিকে তাকিয়ে এবার সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন মণিকাদি।

আমাকে বাঁচালেন সুলতাদি। তিনি আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই আবার বলে উঠলেন, 'এ তো সবাই বলবে! কমিটীর অনেকদিন আগেই এটা বিবেচনা করা উচিত ছিল। এই স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের মাইনেই তো অন্ততঃ দু'শ' হওয়া উচিত; তার ওপর ফ্রি কোয়ার্টার্স কিংবা হাউস এ্যালাওয়েন্স।'

মণিকাদি কিন্তু তখনও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'সত্যি, কি আশ্চর্য!' কিছু একটা না বললে অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকবে।

'আশ্চর্য না আশ্চর্য! জানো, এই কমিটীই আমাকে দিয়ে

হেডমিস্ট্রেসের কাজ করিয়ে নিচ্ছিল, অথচ পুরো এক বছর পারমানেন্ট করেনি! এই সুলতাই তো তখন কত করে সেক্রেটারী প্রেসিডেন্টের বাড়ি গিয়ে গিয়ে আমার জন্য বলেছে—তবে না আমি পারমানেন্ট হয়েছি!'

দেওয়া-নেওয়া দান-প্রতিদান, এই নিয়েই তো পৃথিবীর যত কাহিনী।

আবছাভাবে যেন মনে পড়ছে কাল না পরশুদিন এইঘরে ঐ চেয়ারে বসেই মণিকাদি জ্যোৎস্নাদিকে ধমকে উঠেছিলেন, 'স্কুলের ফাণ্ডের এখনও এমন অবস্থা হয়নি যে, তোমাদের ইচ্ছেমতো পাঁচটাকা দশটাকা মাইনে বাড়িয়ে দেবে। কমিটী যা স্থির করেছে, ভালো বুঝেই করেছে। আমাদের কমিটী কখনও অবিবেচনার পরিচয় দেয় না, এটা অন্তত মনে রেখো।'

জ্যোৎস্নাদি মুখ নিচু করে চলে গিয়েছিলেন।

'আশা করি, আজকের মীটিং-এ তোমরা আমার হয়ে কথাটা একটু তুলবে।'

তারপর আর একটু ফিস্‌ফিসিয়ে বললেন, 'আমি কিন্তু তোমাদের একটু-আধটু বাধা দেবো আমার কোন কিছুর দরকার নেই বলে, কিন্তু তোমরা·· ···'

মণিকাদিকে থামিয়ে দিয়ে সুলতাদি বলে উঠলেন, 'ও আর বলে দিতে হবে না, আমরা দু'জনেই যা বলবার সব বলবো।'

আমিও মাথাটা একটু নাড়িয়ে দিলাম; এসব ক্ষেত্রে পাথরের মতো বসে থাকাটা কোন কাজের নয়।

'তোমার ব্লাউজের হাতে লেসের কাজটা বুঝি তুমি করেছ?'

সবিনয়ে স্বীকার করলাম।

'চমৎকার হয়েছে—সত্যি কি অদ্ভুত গুণের মেয়ে তুমি!' মণিকাদি মুগ্ধদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মীটিং হবার কথা স্কুলে, সূর্যাস্তের আগে। কিন্তু আমাদের মীটিং হয় সেক্রেটারীর ড্রয়িং-রুমে, সন্ধ্যার পরে। আপত্তি কেউ করে না। মীটিং-এর শেষে সেক্রেটারী বড় ডিসের ব্যবস্থা করেন।

কমিটীর মীটিং-এ বিশেষ প্রাধান্য নিয়ে বসে থাকেন সভাপতি, সম্পাদক ও প্রধানা শিক্ষয়িত্রী। কিন্তু তার আগে অন্য সদস্যদের

কথাই বলি। যিনি বিদ্যোৎসাহী, শিক্ষাবিষয়ে অগ্রণী—এই হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন, স্কুলের শিক্ষার উন্নতিতে তিনি হলেন সর্বাপেক্ষা উদাসীন। বরং স্কুলের বেঞ্চিগুলি আর কতটুকু সরু এবং ছোট হলে কাজ চলে যেত, তার হিসেব রাখাটাই তাঁর কাছে বেশি উপভোগ্য। কেননা, এম-এ পাস করেও তিনি শিক্ষাবিদ্ নন—কাঠের ব্যবসায়ী।

আবার ছাত্রী-অভিভাবক হয়ে যাঁরা কমিটীতে এসেছেন, তাঁরা ভেবেই রাখেন যে, মীটিং-এ তাঁদের একমাত্র কর্তব্য হলো পঠন-পাঠনের সামান্যতম খুঁতটুকু ধরে শিক্ষয়িত্রীদের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করা। এঁরা গার্জেন-মেম্বার বলে নিজেদের জাহির করে শক্তির পরিচয় দেবার চেষ্টা করেন; অথচ অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে, বাড়িতে পুত্র-কন্যাকে দেখবার বা পড়াবার জন্য এঁরা এতটুকু সময় নষ্ট করতে চান না। এঁরা বাবা-কাকা হয়ে যে দায়িত্ব পালন করতে নারাজ, আমরা, হতভাগ্য দিদিমণিরা সে কর্তব্য নিখুঁতভাবে পালন করে তাঁদের মেয়েদের কেউকেটা করে তুলবো—এটাই তাঁদের দাবী।

অর্থদাতা বা ডোনার হিসেবে যিনি আছেন, মীটিং-এ তাঁর বক্তব্যের মূলসূত্রই হলো ছাত্রীদের কাছ থেকে ঠিকমতো মাইনে আদায় হচ্ছে কিনা; না হয়ে থাকলে হেডমিস্ট্রেস ও শিক্ষয়িত্রী প্রতিনিধিদ্বয়ের দিকে ঘনঘন তাকিয়ে মাইনে আদায়ের জন্য পুনঃ পুনঃ অজস্র উপদেশ বর্ষণ করেন—অবশ্য ডোনার হয়েও তিনি এ পর্যন্ত স্কুল ফাণ্ডে কত দিয়েছেন, আমাদের মনে সে প্রশ্নটা মাঝে মাঝে প্রবল হয়ে ওঠে।

কমিটী-মেম্বারদের মধ্যে সব চাইতে উপকারে লাগেন ডাক্তার সদস্যটি। যেহেতু তিনি স্কুল-কমিটীতে আছেন, সেই হেতু আমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁরই ডাক পড়ে আগে। তিনি দর্শন দেন, কিন্তু দর্শনী নেন না। আমরা, শিক্ষয়িত্রীরা এমন লোকের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

ফাউণ্ডার মেম্বার যদি আসল ফাউণ্ডারের বংশাবতংশ হন—তবে স্কুলের দায়-দায়িত্ব নিয়ে কিছুই মাথা ঘামান না; আবার নিজে যদি ফাউণ্ডার হন, তবে স্কুল সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহের প্রাচুর্য অনেক সময় পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে।

শিক্ষয়িত্রী-প্রতিনিধি দু'জনের বিলেতের রাজার মতো কেবল খাতায় সই ছাড়া অন্য কোন কাজ বা কর্তব্য নেই—তবে মাঝে মাঝে 'হাঁ, হুঁ, তাতো বটেই'—এই রকম করতে হয়। উপরন্তু কোন প্রভাবশালী সদস্য যদি কোন রসিকতা করেন, তবে যতটা না হাসি পায়, তার চাইতে বেশি হাসতে হয়।

অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখতাম আমাদের চারুসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়ের সভাপতির দিকে। বয়েস ষাটের ওপরে, দীর্ঘ কঠিন চেহারা; হাতের চওড়া কব্জি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, এই বয়েসেও কতখানি কর্মক্ষমতা রাখেন। কেশ-বিরল মস্তকের নিচে উন্নত কপাল, মুখে অটুট গাম্ভীর্য আর অনমনীয় দৃঢ়তা। শিক্ষাকে এত প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে আজ পর্যন্ত আমি কাউকে দেখিনি। সভাপতির দিকে তাকিয়ে দেখতাম, আর ভাবতাম—দেশের শিক্ষা-প্রচার ও প্রসার বিভাগের কর্তা হয়ে যাঁদের নাম খবরের কাগজে ওঠে, তাঁদের সঙ্গে এই মানুষটির কতখানি তফাত!

শিক্ষাবিদ্ না হয়েও সম্পাদক শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ভালোবাসতেন। ব্যক্তিগত জীবনে ব্যবসায়ী ছিলেন। যুদ্ধের বাজারে বাড়ি গাড়ি অনেক কিছুই করেছিলেন। ঐশ্বর্যের সঙ্গে কিছু অহমিকাও ছিল। তবে কখনও কোন শিক্ষয়িত্রীকে অসম্মান করেননি—যদিও তাঁর কথাবার্তাতে অনুকম্পার ভাবটি মাঝে-মাঝেই ফুটে উঠতো। আমরা যখন তাঁর কাছে মাইনে বাড়ানোর আবেদন নিয়ে উপস্থিত হতাম, প্রত্যুত্তরে তিনি তখন শুধু দুলে দুলে হাসতেন। যদিও সে হাসি আমাদের মুখে সংক্রামিত হওয়ার সুযোগ পেতো না।

হেডমিস্ট্রেস—স্কুল কমিটীর মধ্যমণি।

আমাদের মণিকাদি আগের থেকে তৈরি করা রিপোর্ট পড়ে যাচ্ছেন, আর মাঝে মাঝে তাঁর ব্যক্তিগত মন্তব্য প্রকাশ করছেন। আজকের প্রথম এ্যাজেণ্ডায় ছিল সহকারী শিক্ষয়িত্রী মিসেস স্মৃতি সেন, বি-এ কে বি-টি পড়বার জন্য ডেপুট করা হবে কিনা।

প্রেসিডেণ্ট তাকালেন মণিকাদির দিকে, 'স্মৃতি সেন তো চার বছর ধরে আছেন, কাজকর্মও ভালোই করছেন। তাঁকে যদি

আমাদের স্কুল বি-টি পড়িয়ে নিয়ে আসে তবে স্কুলেরই উপকারে লাগবে। আপনার কি মত?'

মণিকাদি একটু জোরে বলে উঠলেন, 'যাঁদের পাঁচ বছরের কম সার্ভিস, তাঁদের তো আজ পর্যন্ত আমরা পাঠাইনি। আর তা ছাড়া এবার স্মৃতিকে পাঠালে আমাদের একটু অসুবিধেও আছে। ম্যাট্রিকের মেয়েদের জন্য একটা স্পেশাল কোচিং-এর ব্যবস্থা করেছি। গত বছরের রেজাল্টটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কাজেই এই বছরটা ওঁকে ছেড়ে দেওয়া বোধহয় ঠিক হবে না।'

প্রেসিডেন্টের মোক্ষম জায়গায় ধাক্কা দিয়েছেন মণিকাদি। কোন কাজের জন্য স্কুলের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে, এই কথার একটু আভাস দিলেই প্রেসিডেন্ট আর সে কাজের কথা তুলবেন না; সে-কথা মণিকাদি এতদিন এই স্কুলে চাকরি করে খুব ভালো করেই জেনেছেন।

তবে এ বছর আর স্মৃতির গিয়ে দরকার নেই, আসছে বছর পাঠালেই হবে।'

সবাই সায় দিলেন। প্রস্তাব পাস হয়ে গেল।

বিস্ময়ে আমার দু'চোখ ঠিকরে পড়ছিল। আজকে বেলা বারোটার সময়েও দেখেছি, স্মৃতি মণিকাদির কাছে কত মিনতি করে বলছে,—'আজ আমার বি-টি পড়বার ব্যবস্থাটা যেন হয় মণিকাদি। নইলে আমার আর কিছু হবে না, আমার সংসারও আর চলবে না!'

স্মৃতি সেন অকালে স্বামী হারিয়ে এখন কাকার গলগ্রহ হয়ে আছে, মুক্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে বেচারী। মণিকাদি ওর কথা শুনে পিঠে হাত বুলিয়ে আমারই সামনে বলেছিলেন, 'তুমি কিচ্ছু ভেবো না। সব ঠিক আছে। তোমার দরখাস্তটা তো দেওয়াই আছে। ওটা একবার কেবল ফরম্যালি মীটিং-এ প্লেস করতে হবে। আর কেউ না হোক, অন্ততঃ আমি তোমার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবো।' সারাদিন মুখ উজ্জ্বল করে ক্লাশ করেছে স্মৃতি সেন।

জ্যোৎস্নাদির কথাটা একটু তুলতে গিয়েছিলাম, তার সঙ্গে

ভি-এর ব্যাপারটা। মণিকাদি বললেন, 'আমাদের এখন ফাণ্ড পারমিট করবে না।'

ডোনার সদস্যটি একটু উষ্মাভরে বললেন, 'টিচাররা চেয়ে চেয়ে আদায় করবার চেষ্টা করেন কেন? সময় হলে তো স্কুল দেবেই।' কথাটা বলে বড় বড় চোখে তাকালেন প্রেসিডেন্টের দিকে।

প্রেসিডেন্ট একটু হেসে বললেন, 'না চাইলে কি আর আপনারা দেবেন?'

ঠিক হলো এই বিষয় কমিটী ভেবে দেখবেন।

একটা গুরুত্বপূর্ণ এ্যাজেণ্ডা ছিল, স্কুলের বিজ্ঞানবিষয়ে এ্যাফিলিয়েশন নিয়ে। বিজ্ঞান পড়ানোর জন্য বিশেষ অনুমোদনের প্রয়োজন। দরখাস্ত পাঠানো হয়েছিল, উত্তর এসেছে। বিজ্ঞানের জন্য ল্যাবরেটরী এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি আছে কিনা দেখবার জন্য সামনের সপ্তাহে ইন্সপেক্শন হবে। ল্যাবরেটরী সাজানো আছে, কিছু কিছু যন্ত্রপাতিও কেনাকাটা হয়েছে। মুস্কিল হয়েছে মাইক্রোস্কোপের জন্য। ঐ যন্ত্রটি নেই, কিনতে অনেক টাকা। অথচ বছরের ক'দিনই-বা বিজ্ঞানের শিক্ষয়িত্রী ছাত্রীদের দিয়ে ওটা কাজে লাগাবেন!

বুদ্ধি থাকলেই উপায় হয়।

'নবীন, তোমার মাইক্রোস্কোপটি দু'দিনের জন্য স্কুলকে ধার দিও তো। ইন্সপেক্শন হয়ে গেলেই আবার নিয়ে যেও।' ডাক্তার-সদস্যটির দিকে তাকিয়ে স্মিতহাস্যে প্রেসিডেন্ট কথাটি বললেন।

'ঠিক আছে। ইন্সপেক্শনের দিন সকাল বেলাতেই আমি ওটা পাঠিয়ে দেবো।' উত্তর দিলেন ডাক্তারবাবু।

আর একবার দেখেছিলাম, স্কুল ফাণ্ডে যতটা টাকা থাকার দরকার, ততটা না থাকায়, সেক্রেটারী ইন্সপেক্ট্রেস্কে নিজের এ্যাকাউন্টটাই একটু এদিক ওদিক করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

ওপরওয়ালাদেরও যেমন আব্দার চাহিদার শেষ নেই, আমাদেরও তেমনি সীমা নেই ছল আর কৌশলের!

নানান রকম কথাবার্তা হয়ে এবং খাওয়া শেষ করে যখন উঠে দাঁড়ালাম তখন রাত আটটা বেজে গিয়েছে। মনে মনে খসড়া

করছি, কোয়ার্টার্সে ফিরে জ্যোৎস্নাদির প্রশ্নের উত্তরটা কি ভাবে দেবো। তাঁর কথামতো 'এনকোয়ারি' কি আমি করতে পেরেছি? কেন একই স্কুলে একই কাজ করে সমান গুণে গুণবতী হয়ে দু'জন দু'রকম মাইনে পায়, পায় দু'রকম ব্যবহার? আর স্মৃতি সেন? ওর মুখের দিকে তাকাবো কি করে?

হ্যাঁ, বলতে ভুলে গিয়েছি, মীটিং-এ (মণিকাদির বার বার বারণ করা সত্ত্বেও) আমি আর সুলতাদি প্রাণপণে 'ফাইট' করেছিলাম আমাদের হেডমিস্ট্রেসের জন্য। তাঁর এত কম মাইনে কেন? আর কম মাইনে তো হাউস এ্যালাওয়েন্সই বা দেওয়া হয় না কেন···

শেষপর্যন্ত আমাদের আবেদন গৃহীত হলো। আগামী মাস থেকে মণিকাদি কুড়িটাকা বেশি পাবেন।

সবটা হলো না, তা হোক, আবার তো মীটিং হবে—ভয় কি!

রমলা বটব্যাল। নাতিদীর্ঘ, গৌরী—ঈষৎ তাম্রাভ। স্নেহস্নিগ্ধ সুডৌল তনু। তনুশ্রীর তুলনায় মুখশ্রী একটু কঠিন, একটু রুক্ষ। মাথার চুল কুঞ্চিত ও সামান্য পিঙ্গল। সরু সরু দুটি তির্যক বাদামি চোখ। সামান্য চাপা নাকের নিচে পাতলা গোলাপি দুটি ঠোঁট। সামনের দাঁত দুটি একটু উঁচু। সৌন্দর্যের অধিকারিণী বলা চলে না রমলা বটব্যালকে—তবু হঠাৎ দেখলে আচমকা দোলা দিতো প্রত্যেকেরই মনে। সব কিছু মিলিয়ে মনে হতো—বেশ।

নিজের প্রতি অতিমাত্রায় সচেতন রমলা বটব্যালের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না নিজেকে শ্রীময়ী করে তোলার জন্য। তাই নিত্যকার

স্কুলে যাওয়ার সময়েও দেখেছি, রমলার উজ্জ্বল বর্ণ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতো, আরও কুঞ্চিত হতো কানের দু'পাশে গুটিয়ে থাকা ছোট চুলের গুচ্ছগুলি। কটা ভ্রূযুগল হতো দীর্ঘতর ও কৃষ্ণবর্ণ।

কৌতূহলের বশেই নিজের থেকে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলাম রমলা বটব্যালের সঙ্গে—পরিচয় পেয়েছিলাম একটি বিচিত্র চরিত্রের।

"যত সাধ ছিল, সাধ্য ছিল না"—আমাদের এই দৈনন্দিন ক্ষোভে অন্ততঃ সায় মিলতো না রমলা বটব্যালের। কারণ তার স্বোপার্জিত মাসের মাইনেটা ছিল কেবল হাতখরচ, খাওয়া-পরার খরচ অকাতরে জুগিয়ে যেতেন আসামের দু'তিনখানা চা বাগানের মালিক বিত্তবান পিতা, মাসের পয়লা তারিখেই রমলার ঠিকানায় নিয়মিত মনি-অর্ডার আসতো মোটা অর্থ বহন করে। তাই রমলা বটব্যালের সাধ্যের মাপকাঠির প্রমাণ ছিল তার একক ঘরের সিলিং ফ্যান, অলওয়েভ রেডিও, সুদৃশ্য বেডল্যাম্প আর দামী ট্যাপেস্ট্রির কভার দেওয়া মোটা কুশনযুক্ত বেতের ডেক চেয়ারে। ঘরের একপাশের দেওয়ালে সোনালী চেন দিয়ে টাঙানো ফ্রেমহীন লম্বা আরশি, তার নিচে কালো বার্নিশ করা একটি ছোট টেবিলে যাবতীয় টয়লেট,—কিছু পরিচিত, কিছু অপরিচিত ।

স্কুলের দেওয়া কাঠের শেল্‌ফে সুন্দর করে সাজানো ছিল বিখ্যাত কয়েকজন বিদেশী লেখকের রচনাবলী। নিচের তাকে একপাশে একগোছা ইংরেজী মাসিক পত্রিকা—পর পর তারিখ মেলানো। অন্যপাশে চকচকে চামড়ায় সুন্দর করে বাঁধানো একটি সুদৃশ্য মোটা খাতা। পরে দেখেছিলাম খাতা নয়—এ্যালবাম। এককোণে একটি নিচু আলনা—পরিপাটিভাবে গোছানো ব্লাউজ-শাড়ি, আর নিচের থাকে ছ'সাত জোড়া আধুনিক ফ্যাশানের জুতো।

শুধু ছাত্রীদের মহলে নয়, আমাদের মতো শিক্ষয়িত্রীদের কাছেও কম আকর্ষণীয় ছিল না রমলার সুন্দর, সুশোভিত ঘরখানা।

রমলার জন্ম হয়েছিল আসামে—পর্বতের স্নেহচ্ছায়াতেই সে বড় হয়ে ওঠে—তাই বুঝি-বা তার মুখে বাঙালীয়ানার চেয়ে পার্বতীর ছাপ ছিল বেশি। অনেকেই ভুল করতো রমলাকে

অবাঙালী ভেবে। অল্প বয়সে মাকে হারিয়ে তার প্রায় সমস্ত বাল্য আর কৈশোর কেটে যায় কনভেন্ট আর ফিরিঙ্গী স্কুলের বোর্ডিং-এ। সেখান থেকে সিনিয়ার কেম্‌ব্রিজ উত্তীর্ণ হয়ে আই-এ. বি-এ পাস করে কলকাতা থেকে। বাবার ইচ্ছে ছিল অন্যরকম। মেয়ে বিলেত যাবে, পাস করে ফিরে আসবে, উচ্চপদস্থের সঙ্গে বিয়ে হবে, জাঁকজমকে চমকে যাবে তাঁর সমাজের সবাই। কিন্তু সকলকে বিস্মিত করে আর হতাশ করে রমলা এল কলকাতায়, বি-এ পাস করে চাকরি নিলো শহরতলীর চারুসুন্দরীতে।

মণিকাদি নাকি সেদিন খুবই উল্লাস আর গর্ব অনুভব করেছিলেন এই স্কুলে এমন একটি চটকদার শিক্ষয়িত্রী পেয়ে। বি-এ, এম-এ পাস টিচার তো কতই রয়েছে—ক'জন পারে রমলার মতো ঐ রকম অনর্গল ইংরেজী বলতে কইতে,—অমন এ্যাক্‌সেণ্ট দিয়ে খাঁটি মেমের মতো ইংরেজী শব্দ উচ্চারণ করতে? শুধু মণিকাদিই নয়, ছাত্রীরাও—বিশেষ করে উঁচু ক্লাশের মেয়েরা 'রমলাদি' বলতে জ্ঞান হারাতো। কৃতার্থ হতো একটুখানির জন্য ওর সান্নিধ্যে আসতে পারলে। মাঝে মাঝে দেখা যেত দেয়ালের গায়ে, বোর্ডে বা সিঁড়ির তলায় গোটা গোটা অক্ষরে রমলার নামটি লেখা।

রমলার টয়লেটের খরচের অঙ্ক অপর যে কোন মেয়েকে ঈর্ষান্বিত করতো, তার পরিচ্ছদ থেকে উঠে আসতো একটি সাধারণ মেয়ের অনেক প্রয়োজনীয় খরচ। এক শাড়ি ব্লাউজ পর পর দু'দিন কখনও দেখা যায়নি রমলার অঙ্গে। এক একদিন মণিকাদি অপাঙ্গে তাকিয়েছেন রমলার সাজসজ্জার দিকে, লক্ষ্য করেছেন তার চুল বাঁধার আধুনিকতম রীতিকে।

রমলা যখন মৃদু ছন্দে পা ফেলে পাশ দিয়ে হেঁটে যেত, মন মাতাল হয়ে উঠতো বাতাসে ভেসে আসা মৃদু সৌরভে। কত দামের কী সেণ্ট ব্যবহার করেছে রমলা বটব্যাল, তাই নিয়ে আলোচনা চলতো অনেকক্ষণ। স্নানের জন্য প্রতিদিনই ঈষদুষ্ণ জলে মিশ্রিত হতো নাম-না-জানা গন্ধসুবাস।

রমলার খাওয়ার মেনু ছিল প্রায় আলাদা, ঝাল মসলাহীন তরকারি, যার মধ্যে স্বাদের চাইতে ভিটামিনের প্রাচুর্য থাকতো

বেশি। রমলা ভাত খেতো কম, তার সঙ্গে উপকরণ থাকতো গাজর, বীট, পেঁপেসেদ্ধ ও টম্যাটো, কড়াইশুঁটির স্যালাড। এর জন্যে আলাদা মূল্য ধরে দিতে হতো।—অবশ্য তাতে কিছু এসে যেত না ধনীর তুলালী রমলা বটব্যালের।

সকালবেলা আমাদের টিচার্স কোয়ার্টার্সের সার্বজনীন চায়ের টেবিলে বসে শুকনো বিস্কুট চিবুতে চিবুতে কতদিন আড়চোখে তাকিয়ে দেখেছি রমলার ঘরের দিকে—গাঢ় নীল রঙের ট্যাপেস্ট্রির পর্দা হাওয়ায় তুলে তুলে উঠতো। তারই ফাঁকে ফাঁকে দেখতাম একটি ছোট্ট টিপাই—সাদা আবরণে ঢাকা, তার ওপর চায়ের ঝক্‌ঝকে সরঞ্জাম, একখানা চায়না ডিসে মাখনজেলি মাখানো তু'খানা টোস্ট পাশাপাশি শুয়ে, আরেকটি প্লেটে একটি দ্বিধাখণ্ডিত কুক্কুটাণ্ড—কৃষ্ণবর্ণ মরিচের গুঁড়োর আল্‌তো ছোঁয়ায় খানিকটা মলিন। পাশে একটি স্টেনলেস চামচে, সামনে বসে রমলা কি একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে, আর অতি ধীরে সামান্যতম শব্দটুকু পর্যন্ত না করে চায়ের কাপে সিপ্‌ দিচ্ছে।

অধিকাংশ দিনই স্কুল থেকে এসে সুবেশে সুসজ্জিত হয়ে রমলা বেরিয়ে যেত মহানগরীর দিকে। রমলাব চলে যাওয়ার সুরভিটুকু মিলিয়ে যাওয়ার পরমুহূর্তেই কানে আসতো হরেকরকমের মন্তব্য, 'মেমসাহেব চৌরঙ্গীতে গেলেন বুঝি?'

'লেক পাড়াতেও যেতে পারেন; উনি তো আর আমাদের মতো হেঁজিপেঁজির সঙ্গে মিশবেন না! উনি কথা বলবেন পলি, জেনি, সুরিটার সঙ্গে—আরও কেউ কেউ আছেন কিনা কে জানে?'

চোখ মটকে, মুখ টিপে হেসে উঠতেন মন্তব্যকারিণী।

বাইরে যাবার না হলে রমলা বিকেলে যেত আমার গন্তব্যস্থান স্কুলের মাঠে। সারাদিন মেয়েদের কলকোলাহলে মুখরিত মাঠ বিকেলের ম্লান সূর্যের আলোয় নীরব, শান্ত হয়ে যেন আরও বিস্তার লাভ করতো। বড় ভালো লাগতো তখন তার বুকের সবুজ ঘাসে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে হাঁটতে। এই স্কুলের মাঠে আমাদের তু'জনের আলাপ নিবিড় হয়ে উঠেছিল, আর এই নিবিড়তার সুযোগ নিয়েই একদিন প্রশ্ন করেছিলাম, 'উনি কে?'

উনি, মানে এক ভদ্রলোক। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝেছিলাম,

উনি বাঙালী নন। অনুমান ভুল নয়। মিঃ নটরাজন, মাদ্রাজের সন্তান, বর্তমানে কলকাতায় এক সওদাগরী অফিসের উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তি। মাঝে মাঝে তাঁকে দেখা যেত আমাদের দরজায়। কালো রঙের টু-সিটারখানা চালিয়ে আসতেন। ভদ্রলোকের চেহারায় বৈশিষ্ট্য কিছু ছিল না, দৃষ্টি শুধু আকৃষ্ট হতো তাঁর সুবিস্তৃত ললাটে একটি গভীর ক্ষতের সুদীর্ঘ দাগে।

রমলা আমার দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে বলেছিল, 'নটরাজনের থাকার মধ্যে আছে শুধু ঐ গাড়িখানা আর কপালের কাটা দাগটা।'

'আর কিছুই কি নেই?' সকৌতুকে কথাটা বলে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম রমলার দিকে।

'আর কিছু? ইউ মিন রোমান্স? ফুঃ।'

রমলা তীক্ষ্ণকণ্ঠে হেসে উঠলো।

তার মানে?

'তোমার কাছে উনি ছুটে ছুটে আসেন…'

'আসে আসবে, না এলে সাধবো না।'

সত্যিই রমলা সাধেনি, চোখের সামনে দেখেছি; আর রমলার অবজ্ঞায় ঠোঁট উলটে দেখানো চিঠি পড়ে জেনেছি নটরাজনের অভিমান—অভিমানের পর অভিযোগ।

'কেবলই কতকগুলো মিথ্যে কথা, মিথ্যে অভিযোগ।'

'সব মিথ্যে? তুমি কি ওঁকে কাছে টানোনি?'

'কখ্খনো না। কোনোদিনই আমি নটরাজনকে কিছুমাত্র ইনডালজেন্স দিইনি। ক্লাবে গিয়েছি, কথা বলেছি, একসঙ্গে ব্যাডমিণ্টন খেলেছি, আউটিঙে যোগ দিয়েছি—এতেই যদি ভদ্রলোক ভেবে নেন আই বিলং টু হিম,—আমি নিরুপায়।'

রমলা অতি নিবিষ্টচিত্তে হাতের সুদৃশ্য নখগুলো পরীক্ষা করতে লাগল।

হতবাক হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চলে এলাম নিজের ঘরে। শীলা মিত্র শুয়েছিল। আমাকে দেখে আড়ামোড়া ভেঙে বললো, 'তুমি বুঝি রমলাকে নটরাজন ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছিলে?'

'আমাদের কথা শুনতে পেয়েছ?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'ও আর শুনতে হয় না, এখন আমরা এমনিতেই বুঝতে পারি। তুমি তো এই সবে একজন দেখেছ। আমি অন্ততঃ আরও তিনজনকে দেখেছি যাঁরা এসেছেন, আবার মুখ কালো করে ফিরেও গিয়েছেন। আরও কিছুদিন থাক, তুমিও দেখবে।'

একটু চুপ করে থেকে শীলা আবার বলে উঠলো, 'রমলার এ্যালবামটা দেখেছ—খুব সুন্দর করে মরক্কো চামড়ায় যেটা বাঁধানো?'

মাথা নাড়তে বললে, 'সেটাই দেখোনি, তবে আর রমলার দেখলে কি?'

'খুলেই বলো না।'

মনে মনে অধৈর্য হয়ে উঠছিলাম শীলার এই রহস্যে, সেটা লক্ষ্য করেই বোধহয় শীলা মিটিমিটি হেসে আমার দিকে খানিকটা তাকিয়ে রইল, তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বললে, 'আমাদের এক ফরেস্টার আত্মীয় আছেন; বুঝতেই পারছ শিকারে তিনি কত দক্ষ। শিকার করাটা শুধু তাঁর পেশা নয়, নেশা। তাঁর বাড়িতে একবার বেড়াতে গিয়েছিলাম। তখন তালা খুলে তিনি আমাদের একখানা ঘর দেখিয়েছিলেন। ঘরের মধ্যে সাজানো ছিল অনেকগুলি ছোট বড় লম্বা চৌকো শো-কেস, আর তাতে ছিল বাঘ সাপ গণ্ডার হরিণ বুনো শুয়োর—আরও কত কি! জীবন্ত নয়, খড়ের ওপর চামড়া দিয়ে তৈরি। রাইফেল চালাতে তিনি কত বড় দক্ষ, তাঁর লক্ষ্যভেদ কত অব্যর্থ, তারই নমুনা এইসব। কোন্ বনে কোন্টাকে মেরেছেন, ক'টা কার্তিজ লেগেছিল, শরীরের কোন্ জায়গায় বিদ্ধ হয়েছিল—সব কিছু তিনি আমাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখিয়েছিলেন। গর্বে আর কৃতিত্বে তাঁর দু'চোখ চকচক করে উঠছিল। ছেলেমানুষ ছিলাম, মনে আছে কয়েক রাত ভালো ঘুমুতে পারিনি।'

বাধা দিয়ে বললাম, 'হঠাৎ এ গল্পটা বলার মানে?'

'রমলার এ্যালবামটা দেখো, তা হলেই বুঝতে পারবে। জীবনে ক'টা লক্ষ্য ও ভেদ করেছে—তার সব সাক্ষ্য ঐ

এ্যালবামটার পাতায় পাতায় আছে'—শীলা পাশ ফিরে শুলো। বুঝলাম ও এর বেশি আর কিছু বলবে না।

মনের মধ্যে এক বিরাট জিজ্ঞাসার চিহ্ন নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলাম রমলার আরও কাছে, ওর টুকরো টুকরো কথাগুলিকে একসঙ্গে গেঁথে নিয়ে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম একটি কাহিনী।···

'হাউ হরিব্‌ল্‌, একটি পুরুষের গলায় মালা দিয়ে চিরকাল তার কলাবৌ সেজে থাকবো, কায়মনোবাক্যে প্রশ্রয় দেবো স্বামীর বর্বরতাকে, আর সেন্সাস্‌ অফিসের সাহায্য নেবো সন্তানের সংখ্যা গুণে নেবার জন্য! হোয়ট্‌স্‌ হেলিশ লাইফ।'—রমলা শিউরে ওঠে রুমাল দিয়ে আলতোভাবে চেপে ধরে কপালটাকে।

রাত্রিবেলা খাওয়াদাওয়ার পর প্রায়ই যেতাম রমলার ঘরে। খানিকটা সময় গল্প করতাম। রমলা আমার হাতে তুলে দিতো ওর সুগন্ধী মশলার কৌটোটা। ঘরে তখন জ্বলতো নীল বেডল্যাম্প। রমলা গরম জলে মুখ ধুয়ে আসতো, একটা মোটা টার্কিশ তোয়ালে দিয়ে স্পঞ্জ করে করে মুখের জল মুছে ফেলতো, তারপর দু'হাতের দু'আঙুলের মাথায় ক্রীম তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে ম্যাসাজ করতো সমস্ত মুখে, চিবুক থেকে কপালে, নাকের দু'পাশ থেকে কানের গোড়ায়। দেয়ালের সাদা লাইটটি জ্বালিয়ে এর পর দাঁড়িয়ে থাকতো লম্বা আর্শিটার সামনে, পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতো নিজের দিকে—খুশির উচ্ছ্বাসে মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠতো।

'ওখানা কি, এ্যালবাম বুঝি?'

'হ্যাঁ, আমি যখন একমাসের—তখন থেকে আজ পর্যন্ত সব ছবি ওতে আছে, ভারী মজা লাগে দেখতে'—রমলা নিজেই এ্যালবামখানা টেনে নিলো, একটার পর একটা পাতা মেলে ধরলো আমার আগ্রহ-বিস্ফারিত চোখের সামনে। মেমসাহেব নার্সের কোলে একমাসের শিশু রমলা, প্যারাম্বুলেটরে ছ'মাসের রমলা, পিছনে দাঁড়িয়ে খাসিয়া আয়া, ছোট্ট ট্রাই-সাইকেলে বসে আছে তিনবছরের রমলা, বাচ্চা পনির ওপর চড়ে বেড়াতে যাচ্ছে সাত বছরের রমলা। এরপর রমলা ভর্তি হয়েছে স্কুলে—স্কুলজীবনের কতকগুলি চঞ্চল সবল অধ্যায় আটকে পড়েছে ক্যামেরার

যাতুকলে। পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছি। রমলা ক্রমে বড় হয়ে উঠছে, ঋজুদেহ বঙ্কিম রেখায় লীলায়িত হয়েছে, চোখের দৃষ্টি হয়েছে অর্থদ্যোতক। রমলা অপরূপ ভঙ্গিমায় বসে আছে ওদের ফুলবাগানের মাঝখানে বেতের চেয়ারে।

'আমার পনের বছর বয়সের ছবি—সবে জুনিয়ার কেম্‌ব্রিজ পাস করেছি।'

'ফুলবাগানে ফুলের মতোই ফুটে আছ।'

'ওঃ, খুব যে ফ্ল্যাটারি হচ্ছে'—রমলা চকিতে একবার দেখে নিলো আর্শিতে প্রতিফলিত নিজের ছায়াটিকে।

'হিয়ার আই এ্যাম কোয়াইট এ গ্রোন আপ গার্ল—' পরের পাতাটি খুলে ধরলো রমলা, পরিধানে স্কার্ট, পায়ে কেড্‌স্, হাতে টেনিস র‍্যাকেট, টেনিস লনে দাঁড়িয়ে আছে হাস্যমুখী রমলা, পাশে দাঁড়িয়ে একটি তরুণ, মনে হালো সবে কৈশোর অতিক্রম করেছে, তারও হাতে টেনিস র‍্যাকেট, আর মুখে খুশির জোয়ার।

'অনন্তমাধব বেজবড়ুয়া, ইউনিভার্সিটির ফ্লাওয়ার ছিল। লেখাপড়া—আর খেলা দুটোতেই হি ওয়জ ওয়াণ্ডারফুল।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন কোথায় আছেন?'

'গড নোজ, ক'দিন খেলাধুলো করেছি, তারপর কোথায় গিয়েছে কি করেছে খবর রাখিনি—' রমলা পাতা ওল্টালো। রমলার জন্মদিনের ছবি। কয়েকজন সুবেশ তরুণ-তরুণী রমলাকে মাঝখানে রেখে ফটো তুলেছে। পাশের ঘন সন্নিবিষ্ট ছেলেটিকে দেখিয়ে বললো, 'সুন্দর চালিহা—এই অল্পবয়সেই বিজনেস সার্কেলের একজন ম্যাগনেট হয়ে উঠেছিলেন। বোধহয় তারই পরিচয় দেবার জন্য মিস্টার চালিহা আমাকে একদিন হঠাৎ একটি জুয়েল সেট করা রিস্টওয়াচ উপহার দিতে এসেছিলেন। অবিশ্যি নিতে পারিনি—আর তারপর থেকেই ভদ্রলোক তাঁর আসা-যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিলেন। হাউ ফানি!'

এক বিচিত্র হাসি খেলে গেল রমলার মুখে। পাতার পর পাতা উল্টে গেল রমলা। নদীর বুকে স্টিমার পার্টি, পাহাড়ের কোলে পিকনিক, বনপথে মোটর ট্রিপ, ক্লাবে অ্যাটাম ফেস্টিভ্যাল—নানা ভঙ্গিমায়, নানা সজ্জায় চঞ্চলা, উচ্ছলা রমলা—আর তারই

সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মানুষের মিছিল,—নিরঞ্জন হাজারিকা, পিটার গোমেস, পুরুষোত্তম দাস...

'মিস্টার নটরাজনের ছবিও যে আছে দেখেছি, ফটোতে কিন্তু মানুষটিকে বেশ দেখাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, ওদের ফটোতেই মানায় বেশি।' হাসির রেখায় আবার কুঞ্চিত হলো রমলার মুখখানা।

চেয়ে দেখলাম রমলাকে, তির্যক দুটি বাদামী চোখ তাকিয়ে আছে আর্শিটার দিকে, কুঞ্চিত, পিঙ্গলবর্ণ চুলগুলিকে মনে হলো সাপের ফণা, ফুলে ফেঁপে উঠেছে, কাকে যেন ছোবল মারবে।

রমলা আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছে কত জায়গায়, আলাপ করিয়ে দিয়েছে চিদানন্দ সিংহ, মিস্টার গুজরাল, অধ্যাপক অতনু বোস, ডাক্তার খালিফ—আরও কতজনের সঙ্গে। ধনুকের ছিলার মতো বঙ্কিম ভ্রূ টেনে, কৃষ্ণপল্লব ঘেরা বাদামী চোখে রহস্যময় কটাক্ষ করে, গোলাপী ঠোঁটে মধুর হাসি হেসে রমলা সুন্দরভাবে কথা বলেছে এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে। আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি রমলার চোখ আর ভ্রূ অত কালো নয়, ঠিক যতখানি দেখায় ততখানি রক্তিম নয় ওর ঠোঁট। বেড়াতে যাবার আগে রমলা অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক সময় নিয়েছে নিজেকে ছন্দময়ী করে তোলার জন্য।

রমলা উজ্জ্বল হয়ে কথা বলেছে ডাক্তার খালিফের সঙ্গে, আবার ঘাড় বেঁকিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিমায় তাকিয়েছে অতনু বোসের দিকে। পিকনিকে মিস্টার গুজরাল ওকে দুটো স্যাণ্ডউইচ জোর করে খাওয়ালে, রমলাও ব্যাকুল হয়ে নিজের হাতে চারটে সন্দেশ তুলে দিয়েছে গুজরালের ডিসে।

কী উচ্ছ্বাস, কী কলরব! কিন্তু তারপর?

রমলা অকস্মাৎ ছেদ টেনে দিয়েছে এই বন্ধুত্ব যখন আরও নিবিড়, আরও ঘনীভূত হতে চেয়েছে। ভিক্ষাপাত্র হাতে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন চিদানন্দ সিংহ, মিস্টার গুজরাল আর ডাক্তার খালিফ। দীর্ঘ চিঠিকে কত আকূতি দিয়ে দীর্ঘতর করে পাঠিয়েছেন অধ্যাপক অতনু বোস। রমলা নির্বাক কঠিন ঔদাসীন্যে তাঁদের

প্রত্যাখ্যান করেছে। তাঁদের ব্যথাবেদনা বিন্দুমাত্র বিচলিত করেনি ওকে।

শুধু লক্ষ্য করেছি রমলার ছেদ পড়তো না কেবল একটি গবেষণায়—কি করে গায়ের চামড়া হবে আরও সতেজ ও উজ্জ্বল, মুখ ভরে উঠবে নবনীত সুষমায়।

রমলা প্রায়ই দাঁড়াতো ওর সোনালী রঙের চেনে আটকানো ফ্রেমহীন লম্বা আর্শিটার সামনে, প্রতিফলিত ছবিটিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতো। একটা নিবিড় সন্তোষ আর তৃপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো ওর নিজের মুখখানা।

বছর ঘুরে গেল। এক ছুটির দুপুর। আমার ঘরে বসে জন কয়েক মিলে তুমুল তর্ক করছিলাম স্কুল কোডের একটা নিয়ম নিয়ে। পর্দা ঠেলে রমলা এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালো। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রায় সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, 'সমস্ত কপালময় ও কী উঠেছে! ফুস্কুড়ি মতো!'

'ঠিক বুঝতে পারছি না, দু'তিনদিন আগেই উঠেছে। আগে দু'চারটে ছিল, এখন সমস্ত কপাল ছেয়ে গিয়েছে'—একটা প্রবল উৎকণ্ঠা জেগে উঠলো রমলার কণ্ঠস্বরে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'ডাক্তার দেখাওনি?''

'দেখিয়েছি; বললেন বড্ড বেশি ভিটামিন ইনজেকসন নেওয়ার রি-এ্যাকস্যন। ওষুধ খাচ্ছি, ইনজেকসনও নিতে হতে পারে।'

এরপর অনেকে অনেকরকম বললেন। কেউ বললেন, ত্রিফলার জল পান করা এর একমাত্র ওষুধ অথবা স্নানের আগে কপালের ওপর বেশ করে পাতিলেবু ঘসে দিলে ওগুলো একেবারে মিলিয়ে যাবে। প্রমীলাদির প্রেসক্রিপ্সন আবার অন্যরকম। রোজ সকালে খালিপেটে দু'টুকরো কাঁচা হলুদ একটু আখের গুড় দিয়ে চিবিয়ে গিলে ফেলা—চর্মরোগের ধন্বন্তরী।

রমলা ধীর মন্থরভাবে নিজের ঘরে চলে গেল।

এরপর রমলার খবর নিয়েছি, চিকিৎসা চলেছে, ইনজেকসনের রি-এ্যাকস্যন ইনজেকসন দিয়েই দূর করা হচ্ছে। ওষুধ চলেছে ঘড়ি ধরে পালা করে।

একদিন মুখের দিকে তাকিয়ে খুশি মনে বললাম, 'বাঃ, এই তো ইরাপসানগুলো বেশ মিলিয়ে যাচ্ছে—ডাক্তার রুদ্রের হাতযশ আছে বলতে হবে।'

'এগুলো মিলিয়েছে, কিন্তু...'

রমলা কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। অবাক হলাম। সকলের থেকে স্বতন্ত্র রমলা একটু উদ্ধত আত্মসচেতন। দেখলাম একটা ম্লান অস্পষ্টতার কুহেলিকা নেমে আসছে রমলার আঁটসাট দেহে, আর ঘন পিনদ্ধ লাবণ্যে।

সব সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে বললাম, 'একটা কথা বলি তোমায়, যদি কিছু মনে না কর—'

রমলার দৃষ্টি সতর্ক হয়ে উঠলো।

'আজ কিছুদিন ধরে তোমার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না বোধহয়?'

রমলা বিষণ্ণহাসি হাসলো, 'কেন, বেশ ভালোই তো!'

'না, তোমার চেহারা ফ্যাঁকাসে হয়ে যাচ্ছে, সে গ্ল্যামার নেই—'

আমার ওপর একবার চকিতদৃষ্টি নিক্ষেপ করে কোন উত্তর না দিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে রমলা চলে গেল নিজের ঘরে।

সেদিন রাত্রিবেলা রমলার ঘরে পর্দা ঠেলে ঢুকতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আর্শির সামনে স্থির হয়ে আছে রমলা, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করছে নিজের ছায়াটিকে। আলতোভাবে স্পর্শ করছে চোখের কোণ আর নিচের ঠোঁট। ভেতরে আর গেলাম না, দরজার গোড়া থেকেই ফিরে এলাম। অত করে কি দেখছে রমলা? ভ্রূযুগলের কালিমা, না অধরৌষ্ঠের আরক্তিম পেলবতা?

তার পরদিন। স্কুলে যাবার আগে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল রমলার সঙ্গে, থমকে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত: করে মুখ তুলে ঠোঁটের ওপর আঙুল দিয়ে শুষ্ককণ্ঠে বললো, 'দেখো তো, কোন স্পট দেখতে পাচ্ছ কিনা?'

'স্পট? কই না!'

'না?' একটু যেন নিশ্চিন্ত হয়ে রমলা নিচে নেমে গেল।

কিন্তু সন্দেহের অবকাশ আর রইল না। ঠোঁটের নিচে বাদামী রঙের ছোট্ট একটা গোল টিপ—ক্রমে বড় হলো, বাদামী রং

সাদা হলো, সাদা কলঙ্করেখা দাগ কেটে দিলো রমলার চোখের কোণে আর কপালের একপাশে।

শীলা মুখ টিপে একটু হেসে বললো, 'এতো আমি জানতাম। একবার রমলার বাবা এসেছিলেন। সাহেবের মতো কটা রং—তবুও ঢাকতে পারেননি। সামান্য শীতেই হাতে পরেছিলেন গ্লাভস্। কিন্তু চোখ, কপাল—এগুলো তো আর ঢাকতে পারেননি। কলকাতায় এসেছিলেন ইলেকট্রিক ট্রিটমেণ্ট করাতে। কিন্তু কোন ট্রিটমেণ্টেই তো ও রোগ সারে না…। রমলা তো ঐ জন্যেই বাপের কাছ থেকে পালিয়ে এল। তা নইলে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে পাহাড়ের কোণে কোণে যে লুকোচুরি খেলছিল, সে কেন মরতে আসবে চারুসুন্দরীতে আমাদের চিমসে মুখগুলো দেখতে? বাবা মেয়েকে দেখে চলে যাবার পর ওষুধ ছিটিয়ে সে কী ঘর ধোয়ার ধুম! ভদ্রলোক যে চেয়ারটিতে বসেছিলেন, সাতদিন সাতরাত সেখানা ছাতে ফেলে রাখা হলো—রোদে শুকলো, হিমে ভিজলো…বাপের স্পর্শ দোষটুকুও যেন কোথাও না থাকে। কিন্তু রক্ত? রক্তের দাগ যাবে কোথায়?'

মাস দুয়েক পরেই শুনলাম রমলা চলে যাচ্ছে আসামে নিজেব বাড়িতে। চাকরি আব করবে না।

'একটা মেয়ের জীবনে কত মানুষই না ভিড় জমালো, অথচ আশ্চর্য, ও কিন্তু কখনও কাউকে কাছে টানলো না।'

'টানবে না তো!' শীলা ফিসফিস করে বললো, 'নার্সিসাসের গল্প পড়নি, সেই যে সুন্দর ছেলেটা পুকুরের জলে নিজের ছায়া দেখে তার প্রেমে পড়েছিল?'

গল্পটা পড়েছি। কিন্তু মানুষের জীবন তো গল্প নয়।

'রমলা ভালোবাসে শুধু ওর এ্যালবামটাকে, আর কাউকে নয়।'

ঘণ্টা তিনেক আগে রমলা চলে গিয়েছে, ওর শূন্য ঘরটায় এসে দাঁড়িয়েছি। সন্ধ্যাবেলার আবছা আলো ঘরখানাকে বিষণ্ণ করে তুলেছে। চোখে পড়লো একদিকের দেয়ালের খানিকটা অংশ—

রমলার আর্শিটা যেখানে টাঙানো থাকতো। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম। কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম, মনে নেই। হঠাৎ চমকে উঠলাম—কে যেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো দেয়ালটার গায়!

পরক্ষণেই হেসে ফেললাম, নিশ্বাসটা ফেলেছি আমি।

সুনয়নীদি বললেন, 'একটা গান শুনবি, সেকেলে কলকাতার একটা ছড়াগান?'

অতিলক্ষ্মী বুদ্ধিমতী এক বিবি এসেছে,
ষাট বৎসর বয়স তবু বিবাহ না করেছে।
করে তুলেছে তোলাপাড়ী এবার নাইকো ছাড়াছাড়ি,
মিস্ কার্পেন্টার সকল স্কুল বেড়িয়ে এসেছে।
কি মান্দ্রাজ কি বোম্বাই সবই দেখেছে,
এখন এসে কলকেতাতে (এবার) বাঙালীদের নে' পড়েছে॥

দু'জনেই হেসে উঠলাম।

মিস্ মেরি কার্পেন্টার বিলেতের মেয়ে। সেখানে দেখেছিলেন রামমোহনকে। হৃদয়ের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন তাঁকে, আর ভালোবেসেছিলেন রামমোহনের জন্মভূমি এই ভারতবর্ষকে। মিস্ কার্পেন্টার চলে এলেন এ দেশে, স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন মেয়েদের শিক্ষা দেবার সকল দায়িত্ব। প্রীতিশুভেচ্ছার বিনিময় হলো বিদ্যাসাগর আর কার্পেন্টারের মধ্যে।

'একবার কি হলো জানিস,' জানলার ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে সুনয়নীদি বললেন, 'ওঁরা দু'জনে যাচ্ছিলেন উত্তরপাড়ার মেয়ে স্কুলটি দেখতে। সঙ্গে ছিলেন উড্রো সাহেব আর এ্যাট্‌কিনসন সাহেব। কয়েকখানা ঘোড়ার গাড়িতে তাঁরা যাচ্ছিলেন। বিদ্যাসাগরের গাড়িখানা সকলের আগে, তার পেছনে মিস্ কার্পেন্টারের গাড়ি। উত্তরপাড়ার প্রায় কাছে এসে মোড় ফিরবার

সময় বিদ্যাসাগরের গাড়িখানা হঠাৎ উল্টে গেল। বিদ্যাসাগর ছিটকে পড়লেন রাস্তার ধারে, সংজ্ঞাশূন্য হয়ে লুটিয়ে পড়লেন। ছুটে এলেন মিস্ কার্পেন্টার, অসীম স্নেহে জ্ঞানহারা বিদ্যাসাগরের মাথাটি নিজের কোলে তুলে নিলেন। জ্ঞান ফিরে পেয়ে বিদ্যাসাগর যখন চোখ খুললেন, দেখলেন একটি স্নেহব্যাকুল মুখ,—মিস্ মেরি কার্পেণ্টার—ঠিক যেন মা। বিদ্যাসাগর কোনদিনই এই বিদেশিনী মা'টিকে ভোলেননি।'

শুনেছিলাম এই দুর্ঘটনায় বিদ্যাসাগর আঘাত পেয়েছিলেন পেটে, লিভারে, শারীরিক স্বাস্থ্যের অবনতি শুরু হয়েছিল সেই দিন থেকে।

কথা প্রসঙ্গে একদিন সুনয়নীদিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আচ্ছা, আপনি দেখেছেন সেনেট হলের ঠিক উল্‌টো দিকে গোলদীঘির পারে বিদ্যাসাগরের মূর্তিটি? কী কঠিন মুখ! ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছেন ইউনিভার্সিটির দিকে। দয়ার সাগরের মুখ এত কঠিন কেন?'

সুনয়নীদি মৃদুস্বরে বলেছিলেন, 'কেন জানিস? আমরা আদর্শভ্রষ্ট হয়েছি বলে। উনি যা চেয়েছিলেন তা হয়নি, আমাদের মধ্যে লোভ এসেছে, স্বার্থ এসেছে, বিদ্যাসাগরের আদর্শকে আমরাই ভেঙে ফেলেছি।'

হয়তো তাই। মানবপ্রেমিক বিদ্যাসাগর জীবনের শেষে অকৃতজ্ঞ মানুষের বিষাক্ত বঞ্চনায় বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিলেন। সে খবর ক'জনেই বা রাখে?

আমার চাকরিজীবনে শান্ত স্নেহচ্ছায়া ছিলেন সুনয়নীদি। চিরকুমারী সুনয়নীদির কাছে শিক্ষাদান শুধু কর্তব্যই ছিল না, ছিল মহত্তম সেবাব্রত। ব্যক্তিগত সুখস্বার্থ, আমাদের জীবনের কলহদ্বন্দ্বের অনেক ওপরের মানুষ তিনি। শিক্ষাব্রতী জীবনকে আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলেন, তাকেই ভালোবেসেছিলেন। শিক্ষয়িত্রীজীবনের অভাব অনটন নিয়ে আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক কত না অভিযোগ। সুনয়নীদি মাঝে মাঝে বলতেন, 'এপথে

মনকে কখনও তিক্ত করো না; তাতে শুধু কষ্টই বাড়বে, শান্তি পাবে না। মনে রেখো শিক্ষকতা শুধু চাকরি করা নয়। এখানে দেওয়া নেওয়ার পাইপয়সার হিসেব চলে না।'

তাঁর এই আদর্শের কথা শুনে আড়ালে কত ঠাট্টা হাসির ঝড়ই না বয়ে গিয়েছে। আধুনিক বৈশ্যযুগের মানুষ আমরা। কত সময় সুনয়নীদির কথা শুনে মনে হয়েছে, এই আদর্শের ব্যাখ্যা এ যুগে কেই-বা বোঝে!

ইংরেজী বছরের প্রথম দুটি মাস আমরা অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতাম ছাত্রী ভর্তির ব্যাপারে। এই সময়ে অভিভাবক-অভিভাবিকারা তাঁদের মেয়েদের নিয়ে আসতেন; তখন দেখেছি—'কি বিচিত্র এই দেশ!' কত বিচিত্র তার মানুষ।

নতুন ছাত্রীদের স্কুলে ভর্তি করানোর আগে পরীক্ষা দিতে হতো—এই নিয়মটা এখনও আছে। পরীক্ষা হতো সাধারণতঃ ইংরেজী, বাংলা আর অঙ্কের। এ-ক'টি বিষয়ে ছাত্রীদের জ্ঞানের পরিমাণ দেখেই আমরা স্থির করতাম, কে কোন ক্লাশের উপযুক্ত।

মণিকাদির নিয়ম-শৃঙ্খলায় ফাঁক থাকতো না এতটুকু। তাই সপ্তাহের কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে ছাত্রীদের ভর্তি-পরীক্ষা বসতো। সে-সময়ে ছাত্রীদের অভিভাবকদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘটতো। আমার শিক্ষয়িত্রী জীবনে অনেক ছাত্রীর পরীক্ষা নিয়েছি—কারও লিখে, কারও-বা মুখে মুখে। সে দিনগুলির কিছু কিছু ঘটনা এখনও স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি।

এমনি একদিন। এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক এলেন তাঁর ছোট মেয়েটিকে ভর্ত্তি করাতে। গাড়ি থেকে নামতে দেখে তাঁকে আভূমি সেলাম জানিয়েছে দরোয়ান, খুশি হয়ে মুখখানা হাসি-হাসি করে মন্থর গতিতে তিনি ঢুকলেন হেডমিস্ট্রেসের ঘরে, অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। মোটর গাড়ির সওয়ারীকে দরোয়ানও কিছু বলতে সাহস পায়নি। মণিকাদি একটু বিরক্ত হয়েই তাকালেন ভদ্রলোকের দিকে। সশব্দে চেয়ার টেনে টেবিলে একটু ধাক্কা লাগিয়ে বসেই তিনি বললেন, 'নিন দেখি মেয়েটিকে ভর্তি করে ক্লাশ ফাইভে; আমাকে আবার এখুনি ছুটতে

হবে ধর্মতলায়। ইলেকট্রিকের কারবার আছে কিনা, মস্তবড় অফিস, বাড়ি-গাড়িও করেছি খানকয়েক ; তার খাটুনিও তো কম নয়······আপনি কাইণ্ডলি একটু বলে দিন কত টাকা চাই'—সাদা লং কোটটির পকেট থেকে ডিজাইন করা ঝক্ঝকে চামড়ার মনিব্যাগ বার করে ফেললেন। রূপোর ডিবে খুলে গোটা তিনেক পান মুখে পুরলেন, তারপর সশব্দে একটি উদ্গার তুললেন। মণিকাদির ভ্রূ জোড়া একটু কুঁচকে গেল। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন মেয়েটির পরীক্ষা নিতে।

'আবার পরীক্ষা কেন দিদিমণি ? আমার মেয়ে তো সব কিছুই জানে। দু'দুটো মাস্টার রেখেছি—রোজ দু'বেলা এসে ইংরিজী অঙ্ক করায়'—

আরও বোধ হয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন ; মণিকাদি স্থির কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'পরীক্ষা নিয়ে ভর্তি করানোটাই আমাদের নিয়ম।'

ফর্সা, গোলগাল চেহারা আর ফোলা ফোলা মুখ দেখে আগেই আঁচ করে নিয়েছিলাম, এ কেমন মেয়ে। আমার আন্দাজ মিথ্যে নয়। অঙ্ক দিতেই মেয়েটি ডান হাতের একটা আঙুল মুখে পুরে চুষতে লাগল। বারণ করতেই কাঁদো কাঁদো মুখে বলে উঠলো, 'বাপির কাছে যাব।'

'শুধু বাপির কাছে কেন, মামির কাছেও যাবে, এখন এই অঙ্কটি কর তো লক্ষী মেয়ে'—মনে মনে বিরক্ত হলেও শিক্ষয়িত্রীর সহিষ্ণুতা নিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলোতে লাগলাম।

পরীক্ষার ফল জানাতে মণিকাদি বললেন, 'মেয়েকে ক্লাশ ফাইভে ভর্তি করাতে এনেছেন, যা করেছে তাতে তো ক্লাশ থ্রিতেও ওকে নিতে পারি না'—

'সে কি ! তবে যে ইংরিজীর মাস্টারটা বললো আমার মেয়ে ক্লাশ ফাইভেই পড়তে পারবে ? আচ্ছা আজকেই সন্ধ্যের সময় খুব কষে বলবো'খনি—আমি বলছি, আপনি ওকে ক্লাশ ফাইভেই নিন।' মণিকাদি কিছুতেই নেবেন না। অবশেষে ভদ্রলোক বললেন, 'তা আমি যদি আপনারই দুটি একটি দিদিমণিকে আমার মেয়ের জন্য রেখে দি', তা হলে ? কি জানেন আমাদের দু'জনেরই ইচ্ছে, মেয়েটি অল্প বয়সে পাস করে।'

ভদ্রলোক অনেকক্ষণ বকেও যখন মণিকাদিকে টলাতে পারলেন না, তখন আরেকবার সশব্দে চেয়ারটাকে পিছনে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, যাবার সময়ে বলে গেলেন, 'কলকাতার কোন বড় ইস্কুলেই দিই তবে—বাড়ির গাড়ি যখন রয়েছে···।'

একটি বিধবা প্রায়-বৃদ্ধা মহিলা একদিন এলেন তাঁর সাত-আট বছরের নাতনীটিকে নিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে উঠেই চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'কই গো, মাস্টারণীরা, গেলে কোথায় গো ? সিন্ধু দাসী তাড়াতাড়ি মহিলাটিকে নিয়ে গেল বসবার ঘরে। মেয়েটি একেবারেই নিচু ক্লাশে ভর্তি হবে ; তবু মণিকাদি আমাকে বললেন একবার একটু দেখে নিতে। মেয়েটিকে অফিসরুমের পাশে একটা ছোট্ট ঘরে একটু হাতের লেখা লেখবার জন্য নিয়ে যেতেই পিছন পিছন প্রায় ছুটে এলেন দিদিমা। ওঁদের নির্দিষ্ট ঘরে বসবার জন্য আমার সবিনয় অনুরোধ উনি গ্রাহ্য করলেন না। অগত্যা মেয়েটিকে হাতের লেখা লিখতে দিলাম। দিদিমা নাতনীর পাশে বসলেন, 'দু'চারখানা পত্তর নিখতে পারবে, আর আঁক কষে একটু বাজারটা-আসটার হিসাব রাখতে শিখবে—এই মাত্তর। মেয়েছ্যানার নেকাপড়ায় বেশি দরকার নেই বাপু আমাদের বামুনের ঘরে। মেয়ে জন্ম নিয়ে পাস দেবে, নজ্জার মাথা খেয়ে চাগ্‌রি করে টাকা রোচ্‌কার করবে—ও আমাদের ভদ্দরনোকের ঘরে চলে না।' নীরব নিশ্চল নাতনীটিকে একটু ঠেলে দিয়ে বললেন, 'কি লো, চুপ করে আছিস যে, নিকে ফ্যাল্, নেকা না শিখলে বরকে চিঠি দিবি কি করে লো ?'

আরেকবার এসেছিলেন বছর ত্রিশ-বত্রিশের এক যুবক। কোলে একটি বছর তিনেকের শিশু, শিশুসুলভ নোংরামিতে মুখখানা অপরিচ্ছন্ন, বেশবাসের অবস্থাও তথৈবচ। মণিকাদি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ভদ্রলোকটির প্রস্তাব শুনে।

'আমার এই ছেলেটিকে ভর্তি করাতে এনেছি।'

'সে কি! এইটুকু বাচ্চা ছেলে ভর্তি হবে, কি বলছেন ?' আশ্চর্য হয়ে মণিকাদি তাকালেন, 'তা ছাড়া আপনার এই ছেলে কি আর সামান্য অ-আ টুকুও জানে, যে একে স্কুলে দিতে এসেছেন ?'

'অ-আ জানে না, কিন্তু সেটা তো আপনারাই শেখাবেন। আর তা ছাড়া এই বছরটা কিছু নাই বা শেখালেন···শুধু সমস্ত দিনটা আটকে রাখবেন,—তা হলেই হবে।'

মণিকাদি একটু রুষ্ট হয়ে বললেন, 'ঐটুকু বাচ্চাকে আটকে রাখতে চাইছেন কেন বলুন তো? আর ও থাকতে পারবে কেন? কত রকম অসুবিধে বায়নাক্কা'—

ও এখানে থাকলে আমাব ওয়াইফ দুপুর বেলাটা একটু রেস্ট পায়—'

'মাপ করবেন, ঐ বাচ্চার দায়িত্ব আমরা নিতে পারবো না—আপনার স্ত্রীর জন্য আমি দুঃখিত'—মণিকাদি দু'হাত কপালে ঠেকালেন, উঠে যাবার ইঙ্গিত।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন, 'আপনারাই আবার বলেন স্যাক্রিফাইস করছেন—দিদিমণিরা যদি ছেলেদের নাই-ই আটকে রাখতে পারেন—এই সামান্য ডিউটিতেই ফেল করেন, তবে আর এ লাইনে এসেছেন কেন?' মণিকাদি কঠিন জবাব দেবার আগেই ভদ্রলোক হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেলেন। মণিকাদি খানিকটা গুম হয়ে বসে থেকে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, বলতে পারো, এরা আমাদের কি ভাবে?'

আমিও সেই প্রশ্নভরা চোখে তাকালাম মণিকাদির দিকে, এঁরা আমাদের কি ভাবেন?

শুধু তো এই ক'টি ঘটনাই নয়—আবও কত কিছু মন্তব্য মনের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি করেছিল। কোন ছাত্রীর বিয়েতে গিয়েছি—সেখানে দেখেছি, আমরা অপাংক্তেয়। দুটি একটি কথা জিজ্ঞাসাবাদ করে আমাদেব অনুগৃহীত করেছেন সেই বাড়িব গুরুজনবর্গ। রাস্তা দিয়ে হেঁটে গিয়েছি, হঠাৎ চমকে উঠেছি কয়েকটি ছোট ছোট ছেলের সোল্লাস চিৎকারে, 'ও দিদিমণি, ইস্কুলের দিদিমণি গো—' কিংবা 'বেঞ্চিগুলো সরুসরু, মাস্টারগুলো আসল গরু।' একটু ব্যবধানে যেতে 'মাস্টারগুলোর' জায়গায় ব্যবহার করেছে 'দিদিমণিরা'। তাকিয়ে দেখেছি, একদল যুবক দাঁত বার করে হাসছে—ছোট ছেলেরা ওদের নির্দেশ খুব ভালোভাবে পালন করেছে। এরাই ক্লাব গড়ে, নাইট স্কুল খোলে,

সরস্বতী পুজোর সময়ে পাড়ায় পাড়ায় চাঁদা আদায় করতে বেরোয়!

কেবল মেয়ে ভর্তি করানোর সময়েই নয়, যখন বাৎসরিক পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে, তখনও দলেদলে অভিভাবকেরা এসেছেন আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে।

'আমার মেয়েকে পরীক্ষার ফল জানানো হয়নি কেন? কাল স্কুল থেকে ফিরেতক মেয়েটা আমার কেঁদেকেটে হয়রান—এ সবের মানে কি?'

'মানে আপনার মেয়ের মাইনে বাকি আছে, তাই। স্কুলের পাওনা পাই পয়সাটি পর্যন্ত মিটিয়ে না দিলে আমরা প্রোগ্রেস রিপোর্ট দিই না'—মণিকাদি অতি শান্তকণ্ঠে কথাগুলি বললেন।

ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'সা-সামান্য মাইনে বাকি পড়েছে, তার জন্য আপনি রেজাল্ট দেবেন না, এই আপনার হার্ট?'

'সে আপনি যাই বলুন'—মণিকাদি আর কথা বাড়ালেন না।

'একটা ছো-ছোট্ট মেয়ে, কাল বিকেল থেকে কান্নাকাটি করে চোখ ফুলিয়ে রাঙা করে ফেলেছে—আর আপনারা কিনা টা-টাকার কথা তুলছেন! ছিঃ ছিঃ, এই আপনারা দিদিমণি! ছ্যা—', ধিক্কাব নয়তো, ধিৎকার!

ঘণ্টা দুয়েক পরে অবশ্য ভদ্রলোক প্রাপ্য টাকা সব মিটিয়ে রেজাল্ট নিয়ে গিয়েছিলেন।

কেউ এসেছেন মেয়ের পরীক্ষার খাতা দেখতে—তিনি নিজে পড়িয়েছেন, তবু মেয়ে কেন ক্লাশে উঠতে পারলো না। ওঁর ধ্রুব বিশ্বাস, দিদিমণিরা ভালো করে খাতা দেখেননি, কিংবা ওঁর মেয়ের খাতাটা নিশ্চয়ই কোন রকমে চোখ এড়িয়ে গিয়েছে। বেশির ভাগ সময়েই মণিকাদি তাঁর রূঢ় যুক্তির সাহায্যে এই আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করেছেন, রক্ষা করেছেন আমাদেরও। কিন্তু যখন কোন ক্ষমতাবান পুরুষ, স্কুলের কোন প্রভাবশালী মেম্বার এসে অনুরূপ দাবী জানিয়েছেন—মণিকাদি বাধ্য হয়েছেন ছাত্রীর খাতা মেলে ধরতে—ডাক দিয়েছেন সেই হতভাগিনী শিক্ষয়িত্রীকে, যাঁর পরীক্ষিত খাতায় নম্বর-স্বল্পতার জন্য ঐ ব্যক্তি বিশেষের কন্যা, ভাগ্নী, ভাইঝি অথবা স্ত্রীর সহোদরার কন্যা ক্লাশে উঠতে পারেনি।

অভদ্রভাবে সেই দিদিমণির কাছ থেকে কৈফিয়ত চেয়েছেন—'অঙ্কের উত্তরটাই শুধু ঠিক হয়নি, সে জন্যে আপনি একেবারে শূন্য দিয়ে দেবেন? প্রসেস্‌টা তো প্রায় ঠিক করেছে'—কিংবা 'ইংরিজী বিদেশী ভাষা, আপনার এতটুকু সিম্‌প্যাথি নেই, একেবারে লাইনকে লাইন কেটে দিয়েছেন?'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবি, আমাদেরই শুধু 'হার্ট' নেই, নেই 'সিম্‌প্যাথি'!

অভিভাবক-অভিভাবিকারা চোখ রাঙিয়ে ছুটে এসেছেন আরও কত তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে। কোন্ মেয়েকে ক্লাশে অত্যন্ত গোলমাল করার জন্য বা দুর্বিনীত হওয়ার দরুন একটু বেশি বকেছি, কোন্ মেয়েকে মাইনে দেবার জন্য একটু বেশি তাগাদা দিয়েছি, কোন্ মেয়েকে বা ক্লাশ থেকে বার করে দিয়েছি, সেই ক্লাশেরই আবেকটি মেয়ের নতুন-কেনা বইয়ের ওপর নিজের অধিকাব স্থাপন করার গোপন প্রয়াস দেখে। অভিভাবকেরা এসেছেন, অযৌক্তিক কথা বলেছেন, শেষ পর্যন্ত আইনের উল্লেখ করে শাসিয়ে গিয়েছেন। কিছুই করবার থাকতো না আমাদের। রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে শুধু তাকিয়ে থাকতাম নিশীথ অন্ধকাবের দিকে, দেখতাম পুঞ্জীভূত অন্ধকার আরও গভীর, আরও গাঢ় হয়ে উঠছে।

কোন ছাত্রীর বৌদি বা বিবাহিতা দিদিব সঙ্গে দেখা হয়েছে, অথবা খোলা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কথা বলেছি প্রতিবেশিনী বৌটির সঙ্গে। তখনও লক্ষ্য করেছি, আমাদের সেই মর্যাদার অভাব। আমাদের জীবন যে ওদের মতো নয়, সেই ভেবে যেন খানিকটা অনুকম্পা নিয়ে ওরা আমাদের সঙ্গে কথা বলেছে, আমাদের কৃতার্থ করেছে—।

পাশের বাড়ির বৌটিকে হঠাৎ একদিন আমাদেব কোয়ার্টার্সে বেড়াতে আসতে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা কবেছিলাম, 'পথ ভুলে এদিকে যে? এতদিন রয়েছি, কতদিন আসতে বলেছি, কোনদিনও তো আসেননি?'

বাংলা দেশের সরল সাদাসিধে বৌ, বুদ্ধি আর কৌশলের প্যাঁচ মেরে কথা বলতে জানে না, 'কি করবো দিদিমণি, শ্বশুরমশাই আসতে দেন না। বলেন,—ঘরের বৌরা আবার ওসব জায়গায়

যাবে কি! আজ তিনি তিথি করতে রওনা হয়েছেন, আর আমিও চলে এসেছি। খোকনের বাপ আসবার আগেই আরার চলে যেতে হবে: বাপব্যাটা আবার এক গোত্তর কিনা! এখানে এসেছি শুনলেই রাগ করবে।'

রাত্রি গভীরতর হতে থাকে—ঘুম আসে না, চোখ জ্বালা করে। ভাবি, যা পাইনি তার হিসাব মেলাতে তো আমি চাই না—কিন্তু যা পেয়েছি? নিজের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করি কি পেয়েছি? শ্রদ্ধা, সম্মান, মর্যাদা? এতদিন ধরে মুখ বুজে এগারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত ছাত্রীদের যে পড়িয়েছি, ভালো ভালো কথা বলেছি, উৎসাহ দিয়েছি, সকাল সন্ধ্যে ধরে গোছা ভর্তি খাতা দেখেছি—তার কি কোনও প্রতিদান নেই? আমার বিবেক চোখ রাঙায়—প্রতিদান? ও কথাটি তোমার ডিক্সনারী থেকে সযত্নে মুছে ফেলো। ও কথা ভাবলে আর 'স্যাক্রিফাইস' করলে কোথায়?

আবার তাকিয়ে দেখি আকাশের দিকে, তেমনি অন্ধকার থম্‌থমে, বিরাট শূন্যতায় ভরা একটা সীমাহীন হতাশা। ভাবি মণিকাদির কথা। জীবনভোর কাটিয়ে গেলেন এই স্কুলে। রাগ করেছেন, আদেশ দিয়েছেন, সূক্ষ্ম সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন স্কুলের উন্নতি বা নিয়মশৃঙ্খলার কোথাও কিছুমাত্র ফাটল ধরেছে কিনা। নির্দিষ্ট সময়ের বাইরেও তিনি সুকঠিন পরিশ্রম করেছেন চারু সুন্দরীকে আরও সম্প্রসারিত করবেন বলে। কিন্তু কতটুকু লাভ হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে? সামান্য কুড়িটি টাকা মাইনে বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য আমরাই তো তাঁকে নীরবে ধিক্কার দিয়েছি, আড়ালে তাঁর কত না সমালোচনা করেছি!

জীবিকা ও জীবনবোধের মিল খুঁজতে গিয়ে খেই হারিয়ে যায়।

আজ অলস অবকাশের মাঝে বসে বসে ভাবি। কত দিনের কত অভিজ্ঞতা মেঘমেদুর আষাঢ়-আকাশের মতো আনম্র হয়ে উঠেছিল আমার চারদিকে। অভিভাবকদের অযৌক্তিক ব্যবহারে মনে মনে পীড়ন অনুভব করেছি, ক্লান্তিকর গুরুভার

আমার সোনার স্বপ্নকে জড়তার পঙ্কতলে নামিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তবু তো কয়েকজন সহৃদয় অভিভাবকদের দেখা পেয়েছি যাঁরা পিতা হয়েও সন্তানের প্রতি অন্ধবাৎসল্যের চেয়ে তার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা বেশি করে ভেবেছেন, উঁচু ক্লাশে ভর্তি করিয়ে নেওয়া অথবা প্রমোশনের জন্য অন্যায় জেদ বা অহেতুক বাক্-কৌশল অবলম্বন করেননি। আমরা, শিক্ষয়িত্রীরাও তাঁদের কাছ থেকে পেয়েছি অকৃপণ শ্রদ্ধা ও সম্মান।

মনে পড়ে সেই কচি মুখগুলি, আমাদের কাছে ঘেঁষে এসেছে—কখনও কলকণ্ঠে, কখনও অভিমান অনুযোগ নিয়ে। আমার জীবনে আজও সেই মুহূর্তগুলির তুলনা পাই না।

ভুলিনি ব্রজরাণীর কথা। ব্রজরাণী সাহা। তার পর্দানশীন বিধবা মা প্রকাণ্ড গাড়ি করে নিজে এসেছিলেন মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করাতে।

'আমার ছোট মেয়ে, কোলে নিয়ে বিধবা হয়েছিলাম। ছেলে নেই—অভিভাবক বলতেও কেউ নেই। আপনি আপত্তি করবেন না। মেয়েটিকে দয়া কবে ঠাঁই দিন আপনার ইস্কুলে—' মণিকাদির নির্লিপ্ত মুখেব দিকে তাকিয়ে সকাতর অনুনয় করেছিলেন মেয়েটির মা।

মণিকাদি একইভাবে আপত্তি জানালেন, 'কি করবো বলুন, আঠারো বছরের মেয়েকে আমরা ক্লাশ ফাইভে নিতে পারি না, অন্য বাচ্চা মেয়েদের সঙ্গে বয়সের অনেক তফাত হয়ে যায়। আব তা ছাড়া বিবাহিতা মেয়েকে তো আমরা এমনিতেই স্কুলে নিই না...'

'বিয়ে তো ঐ নামেই হয়েছিল মা। ন'বছরের মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলাম। বিয়ের চারমাস পরেই স্বামী হাবিয়ে আবার ফিরে এল আমার কাছে। আপনার ইস্কুলের আর পাঁচটির মতোই মনে করে ওকে আশ্রয় দিন। আপনি একবার দয়া করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। গলার কাঁটা এই মেয়েকে নিয়ে আমিই বা কি করি বলুন তো?' মার গলা কেঁপে কেঁপে উঠলো।

সামনেই দাঁড়িয়েছিলাম। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম।

ধবধবে রঙ, সুগোল পুষ্ট চেহারা, বয়সের তুলনায় অনেক কচি আর নির্বিকার বুদ্ধিহীন মুখ, বড় ভাসা-ভাসা দুটি চোখ শূন্যতায় ভরা। হাতে গলায় আর কানে নিরেট সোনার ভারি জমকালো গয়না; নাকের গয়নাটি বোধ করি অতি অল্প দিন হলো খুলে নেওয়া হয়েছে। একরাশ কালো চুল, প্রায় উপড়ে নিয়ে মাথার পেছনে চক্রাকারে খোঁপা বাঁধা। তাতেও গেঁথে দেওয়া হয়েছে সোনাব ফুল আব কাঁটা।

'পেটের মেয়েটিকে একেবারে গলার কাঁটা বলে ফেললেন?' ঝাঁঝিয়ে উঠলেন মণিকাদি।

'বড় দুঃখে এসব কথা বলি মা—সব সময় বুকে চেপে রাখতে পারি না। বিষয় সম্পত্তিব অভাব নেই, অভাব শুধু শান্তির। নির্বান্ধব পুরীতে শুধু আমি আব এই বাড়ন্ত হাবা মেয়ে, আমার অবস্থায় না পড়লে আমার কথা তো কেউ বুঝবে না'—গায়ে জড়ানো সিল্কের চাদরের একটি কোণ ভিজে ওঠা চোখদুটিতে চেপে ধরলেন মেয়েটিব মা।

মণিকাদি আর আপত্তি করতে পারলেন না। আমার দিকে একবাব দৃষ্টিপাত কবতেই আমিও মাথা হেলিয়ে নীরব সম্মতি জানালাম।

'অত করে বলছেন যখন, আপনার মেয়েকে আমরা নেবো। কিন্তু একটি কথা, ওবকম এক গা গয়না পরিয়ে, সাজগোজ করিয়ে কিন্তু মেয়েকে স্কুলে পাঠাবেন না, আব পাঁচজনের মতোই ওকে এখানে আসতে হবে…'

স্মিতমুখে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ভদ্রমহিলা চলে যেতেই মণিকাদি বললেন, 'এত বড় মেয়ের পাকামিতে বাচ্চা মেয়েগুলোর আবার না শিঙ বেরোয়…'

বাধা দিয়ে বললাম, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। অন্যের মাথায় শিঙ গজাবার ক্ষমতা ও মেয়ের নেই—দেখেছেন না ওর মুখের দিকে তাকিয়ে!'

'সত্যি, কি অদ্ভুত বোকা-বোকা চেহারাটা'—মণিকাদিও সায় দিলেন।

তারপরে ব্রজরাণীকে দেখেছি, নিয়মিত স্কুলে এসেছে, সাজ

পোষাক সরল হয়েছে। চলাফেরাতেও দেখা গিয়েছে খানিকটা .সপ্রতিভভাব।

মেয়ে ভর্তি হবার পালা চুকতে না চুকতেই এগিয়ে আসে সরস্বতী পুজো—ছাত্রছাত্রীদের সার্বজনীন উৎসব। ঐ একটি দিনকে ঘিরে উচ্ছল স্বপ্নের মতোই গড়িয়ে যায় আরও দুটো দিন।

পুজোর আগের দিন মেয়েরা দালান আর সিঁড়ি ভরে আলপনা দিয়েছে, দেবদারুপাতা দিয়ে গেট সাজিয়েছে, রঙিন সিল্কের কাপড় এনে তৈরি করেছে সরস্বতীঠাকুরের পটভূমিকা। দু'পাশে ঝাউ আর পাতাবাহারের টব সাজিয়ে ঘন বনের শ্যামলিমা আনার প্রয়াস দেখে মা সরস্বতীও স্মিতবদনা।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই মণিকাদিব আদেশে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কর্মী ও কর্ত্রী মেয়েরা বাড়ি চলে গিয়েছে, আমিও কোয়ার্টার্সে ফিরে আসবো, হঠাৎ চোখে পড়লো ব্রজরাণীকে—সিঁড়িব নিচে বেঞ্চিতে বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে একটি একটি কবে বাদাম খাচ্ছে।'

'তুমি এখানে বসে কি কবছ—এখনও বাড়ি যাওনি যে?' হঠাৎ কেমন যেন রাগ হয়ে গেল। সারাদিন কাজেব তদ্বিব করতে গিয়ে পবিশ্রম হয়েছে যথেষ্ট, শরীব মন অস্থিব হয়ে উঠেছিল কোয়ার্টার্সে ফিরে একটু বিশ্রামেব জন্য।

'গাড়ি আসেনি যে'—কুণ্ঠিত ব্রজবাণী উঠে দাঁড়ালো, কোল থেকে বাদামের ঠোঙাটা মাটিতে ছড়িয়ে পড়লো, চোখ দুটিতে ফুটে উঠলো ভীতিবিহ্বল দৃষ্টি।

কাছে গিয়ে পিঠে হাত বেখে জিজ্ঞেস কবলাম, 'গাড়ি কখন আসতে বলেছ?'

'আটটার সময়—'

'সেকি! আজ স্কুলে এত রাত হবে—তোমায় কে বললে?'

মুখ নিচু করে বাঁ পায়ের জুতোর মুখটা কঠিন মেজের ওপর ঘষতে লাগল ব্রজরাণী, কোন উত্তর দিলো না।

'কোথায় তাড়াতাড়ি বাড়ি যাবে, ঘুমিয়ে পড়বে—কালকে কত ভোরে আসতে হবে বলো দেখি।'

'বাড়ি যেতে আমার ভালো লাগে না যে…'

অবাক হলাম ওর কথা শুনে।

'কেন? বাড়িতে মা রয়েছেন—আর তোমার বাড়ি যেতে ভালো লাগে না?'

'মা থাকলে কি হবে, মা যে কেবল বকে। বলে, তুই মরে যা, তুই মলে আমার হাড় জুড়োয়।'

আমার স্তম্ভিত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে ব্রজরাণী বললো, 'হ্যাঁগো দিদিমণি, সত্যি বলছি। মা কেবলই আমাকে বকে আর কাঁদে।'

বকে আর কাঁদে! মনে পড়লো ওর ভর্তি হবার দিনটির কথা। গলার কাঁটা এই মেয়েকে নিয়ে মায়ের কত না ভাবনা!

পাশে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন ব্রজরাণী, তুমি কি করেছিলে?'

'আমি তো কিচ্ছু করিনি, ঐ হাবুলদাই তো আমাকে টেনে নিয়ে যেত খালি খালি।'

'হাবুলদা কে?' নিশ্বাস রুদ্ধ করে জিজ্ঞেস করলাম।

'জামাইবাবুর ভাই যে গো, আমাদের বাড়ি বেড়াতে এসেছিল ও-বছর দোলের সময়! ঐ তো আমার সঙ্গে দুষ্টুমি করলো…'

'দুষ্টুমি করলো! কি দুষ্টুমি ব্রজরাণী?'

'বা রে—মা যে আমাকে কত মারলো, তারপর আমাকে নিয়ে চলে গেল আমাদের কাশীর বাড়িতে—সেখানে বুড়িমা এসে আমাকে বিচ্ছিরি তেতো-তেতো শেকড়বাটা খেতে দিলো আর…' হাত দিয়ে সজোরে চেপে ধরলাম ব্রজরাণীর মুখ। একটা হিমশীতল স্রোত আমার শিরদাঁড়া বেয়ে শিরশিরিয়ে নেমে গেল।

'চুপ চুপ ব্রজরাণী, বলতে নেই, কাউকে বলতে নেই এসব কথা…' থর থর করে কেঁপে উঠলো আমার সমস্ত শরীর। ব্রজরাণী অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। ওর নিষ্পলক নিরুদ্বিগ্ন দৃষ্টির মধ্যে কোথাও খুঁজে পেলাম না কলঙ্কের এতটুকু রেখা।

'বোকা মেয়ে, হাবা মেয়ে,—আর কারও কাছে একথা বলো না—'

'বলিনি তো। মা তো বারণ করে দিয়েছিল।' ব্রজরাণী

ডানহাতের আঙুলে কর গুণে গুণে বললো, 'মা জানে, দিদি জানে, বুড়িমা জানে, আর আপনি জানেন।'

'আমাকে বললে কেন?'

'বা রে—আপনি যে ভালো-দিদি।'

'না, ভালোদিদিকেও বলতে নেই।'

'আচ্ছা, আমি কখনো কাউকে বলবো না···' একটু থেমে বললো, 'আমি খুব বোকা, না দিদিমণি?'

অন্যদিকে মুখ ফিবিয়ে বললাম, 'না, এবাব থেকে আর বোকা থাকবে না। 'তোমার বুদ্ধি হবে—অনেক বুদ্ধি হবে·· '
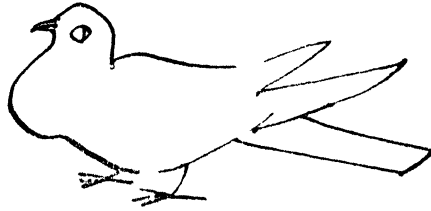
শীতের অপবাহ্ণ। স্কুলেব মাঠে দাঁড়িয়েছিলাম। সামনে চাকসুন্দবীব লাল দোতলা বাড়ি। বুইদি প্রায়ই বলতেন, 'ইস্কুলটার একটা মায়া আছে বে, [illegible] কেবলই আটকে বাখতে চায়··।'

স্কুলের মায়ায় তো আমিও জড়িয়ে গিয়েছিলা[illegible] কিন্তু নির্জন মাঠে ঘনায়মান অন্ধকাবে একান্ত সঙ্গোপনে মনে[illegible] সঙ্গে কথা বলি। মৌন মন মুখব হয়ে ওঠে, অনেকদিনের ফেলে আসা গান আবার গুনগুনিয়ে ফিবে আসে। অন্ধকাব আকাশ কোণে শুনি ভোরের আলোব কানাকানি। এক ঝাঁক পাখী ফিরে যায় সন্ধ্যাব কুলায়।

সুনয়নীদি আমাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে হেসে বলেছিলেন, 'মনে এত দ্বন্দ্ব কেন বে, আব এত দ্বিধাই বা কিসের? এখান থেকে ছুটি নেবাব বাঁশী যদি কেউ বাজিয়েই থাকে, তবে তাতে তোর সাড়া দিতে বাধা কোথায়? তোব অন্তরে আজ নব-বসন্ত, তাকে ফেরাতে নেই·· '

'কিন্তু—'

'না, আর কিন্তু নয়। মিস এ্যান কুকের গল্প তো জানিস—এ দ্বিধা দ্বন্দ্বের দোলায় সেদিন সেই বিদেশিনী মেয়েটিও কি অস্থির হয়নি? জীবনের আদর্শকে ছাড়তে গিয়ে সে কি কম ইতস্তত করেছিল? তবু সে ফিরিয়ে দিতে পারেনি উইলসনকে।'

মিস মেরি এ্যান কুক। তরুণী, শিক্ষিতা খাস বিলেতের মেয়ে। লণ্ডনের ব্রিটিশ এ্যাণ্ড ফরেন স্কুল সোসাইটী তাঁকে পাঠিয়ে দিলো একেবারে সাতসাগরের পারে এই ভারতবর্ষে—কলকাতায় নেটিভ মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য। কলকাতার চার্চ মিশনারী সোসাইটী মিস এ্যান কুককে সাদর অভ্যর্থনা জানালো। মিস কুক মনে মনে খসড়া করতে লাগলেন, অল্পসময়ের মধ্যে কতগুলি মেয়েস্কুল তিনি তৈরি করতে পারবেন।

'সকলের আগে কিন্তু তোমাকে বাংলা শিখতে হবে'—বন্ধুরা জানালো।

'বেঙ্গলি?'

'নিশ্চয়ই—নইলে তুমি বেঙ্গলি নেটিভদের সঙ্গে মিশবে কি করে? বেঙ্গলি মেয়েরাই বা তোমার কাছে আসবে কোন্ সাহসে?'

ঠিক কথা। ইংরেজ দুহিতা মিস কুক মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে পড়তে লাগলেন—অ আ ক খ, ফলফুল, গাছপাতা, তারপর যুক্তাক্ষর দিয়ে আরও বড় বড় বাক্য। একদিন বেরিয়ে পড়লেন ঘর থেকে। কাছেই একটি পাঠশালা, একদল ছোট ছেলে সমস্বরে কি পড়ছে। মিস কুক ওদিকে এগিয়ে গেলেন। ছোট ছেলেরা কেমন বাংলা বলে শুনতে হবে। ঢুকতে বাধা পেলেন। ডুরি শাড়িপরা নোলক নাকে ছোট্ট একটি মেয়ে দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে মুখ ঢেকে কাঁদছে। চোখের জল মুছে মুছে চোখ দুটি লাল, আঁচলের কোণটি ভিজে। আশ্চর্য হলেন মিস কুক। মেয়েটির পিঠে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'হোয়াই সো উইপিং, তুমি কাঁদছ কেন?' অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর মেয়েটি ভিজে ভিজে গলায় বললো, 'আমি পড়বো।'

'বেশ তো।'

'পণ্ডিতমশায় আমায় পড়তে দেয় না যে, আমার ভাইকে পড়ায়, আমাকে পড়ায় না।'

'আমি তোমাকে পডাবো।'

'মা বকবে।'

'আমাব হাত ধরো, আমাকে তোমার মায়ের কাছে নিয়ে চলো।'

মিস এ্যান কুক ঢুকে পড়লেন একেবাবে বাড়িব ভেতর। রান্নাঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, 'দিদি—তোমাব মেয়েকে আমি পডাবো।'

সাদা মেমসায়েবকে দেখে একগলা ঘোমটা টেনে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটিব মা। একথা শুনে ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো, 'বলে কি গো! লেখাপড়া শিখলে মেয়ে যে বিধবা হবে!'

'বিধবা হবে? উইডো? ও ডিয়াব, নো নো—উইডো কেন হবে? তোমার মেয়েকে লেখাপড়া শেখাও দিদি। ঈশ্বব তোমাদের মঙ্গল করবেন।'

মিস কুক দেখা করলেন পাডাব অন্যান্য মায়েদেব সঙ্গে, একই আবেদন পেশ কবলেন তাদেব কাছে। অন্তরেব ডাক অন্তবে গিয়ে আঘাত কবলো। মিস এ্যান কুক পাডাব মেয়েদেব নিয়ে স্কুল খুললেন। ছাত্রীও হলো অনেক। শুধু একটি পাডাতেই নয়, মির্জাপুব থেকে ঠন্ঠনে, তাবপব শোভাবাজাব, সেখান থেকে কুমোবটুলি—আবাব ওদিকে মল্লিকবাজার, এই সব ক'টি জায়গাতেই মিস কুক স্কুল খুললেন। দলে দলে মেয়ে ভর্তি হলো। তিনি প্রতিদিন প্রত্যেকটি স্কুলে যেতেন, অনেক ক্লাশও নিতেন; তাবপর দিনেব শেষে অশেষ পবিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিবে আসতেন। ক্লান্তিতে দুটি চোখ বুজে আসতো, রাত্রিবেলা বেড়ির তেলের শেজ জ্বালিয়ে দেয়ালে নিজেব ছায়াটিকে দেখতেন, আর ভাবতেন—আবার কবে কোন্ পাড়ায় আরও নতুন স্কুল গড়ে তুলবেন।

কিন্তু মিস মেবি এ্যান কুক কি জানতেন যে, তাঁর জীবনের একটা বড় পরিচ্ছেদ শুরু হবে এখানে—এই ভিজে মাটিতে?

চার্চ মিশনারী সোসাইটীর অন্যতম পাদ্রী আইজাক উইলসন।

সাদা সারপ্লিস পরে গলায় ক্রুশের পদক ঝুলিয়ে চার্চে যেতেন, মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মিশতেন, অজ্ঞদের মধ্যে আলো ছড়াতেন, শুচিস্নাত সুন্দর জীবন, জীবন-দীপ্তিতে উজ্জ্বল। আইজাক উইলসন—মেরি এ্যান কুক। দু'জনেই শিক্ষাব্রতী, পরার্থেই তাঁদের জীবন উৎসর্গীকৃত। তবু সারপ্লিস ভেদ করে কে যেন দোলা দিলো উইলসনের মনের গভীরে। রাত্রির অন্ধকারে পাদ্রী উইলসন স্বপ্ন দেখেন—কোমল লাবণ্যেভরা একটি মুখ। কত বিচিত্র রজনী কেটে যায়, বসে বসে ভাবেন কুমারী এ্যান কুক। তিনি যে অনেক বড় আদর্শ নিয়ে নিজের বাড়ি ছেড়ে এতদূর এসেছেন, তার এমন হলো কেন? কিন্তু ভেবে কোন কূলকিনারা পান না। মোমবাতিটি জ্বালিয়ে বাইবেল খুলে বসেন। চোখ পড়ে যায় সলোমনের গানে। 'By Night on my bed I sought him whom my soul loveth. I sought him, but I found him not,' শিউরে উঠলেন মিস মেরি এ্যান কুক। তবে কি……?

'হ্যাঁ এ্যানি, ভগবানের বোধহয় এই ইচ্ছে। আমরা দু'জনে তো কম যুদ্ধ করিনি মনের সঙ্গে। তবু হেরে গেলাম কেন? দু'জনে দু'জনকে দূরে ঠেলে দিতে পারলাম না?' উইলসন দু'হাতে তুলে নেন এ্যান কুকের নরম হাতখানা।

মেরি কুক ধীরে ধীরে হাতখানা ছাড়িয়ে নিলেন—'সবই বুঝি, কিন্তু……'

'না না, এর মধ্যে আর কিন্তু নয়। আমাদের বিয়ে হবে, স্বর্গের ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করবেন—'

মিস কুক হলেন মিসেস উইলসন—বাঙালীরা বলতেন বিবি উইলসন।

বুইদি গল্পটি শুনে বলেছিলেন, 'আরে বাপু, মেয়ে তো, তা সে সাদাই হোক, আর কালোই হোক, ঘর না বেঁধে পারবে কেন?'

স্কুলের মাঠে দাঁড়িয়ে ভাবলাম, সত্যিই তো রাত্রির আকাশে

একটি পাখীও তো কই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না! সব ফিরে গিয়েছে কাঠকুটো দিয়ে তৈরি তাদের ছোট্ট কুলায়।
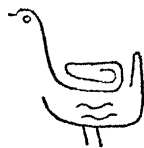
দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি।

রঙ্গমঞ্চে ভরতবাক্য উচ্চারণের আর বিলম্ব নেই। আমার শিক্ষয়িত্রী-জীবনের কল্পান্ত আসন্ন। হাসিকান্নার দোল দোলানো পৌষ-ফাগুনের মেলার মধ্যে কেটে গেল ক'টি বছর। কে জানতো এগারোটা-চারটের নীবন্ধ্র খোপে খোপে এত মধু, আবার এত লবণাক্ত চোখের জল।

নিজের কথা বলতে গিয়ে থেমে যাই, থেমে যাই জীবনের নেপথ্যে যে রঙ্গ-সজ্জা চলে তাকে পাদ-প্রদীপের তলে প্রকাশ করতে গিয়ে। কেমন করে হঠাৎ আলোর ঝলকানি আমার অভ্যস্ত জীবনকে নতুন আবির্ভাবের দরজায় পৌঁছে দিলে, পরিচিত পরিবেশ থেকে তাকে নিয়ে গেল অনেক দূরে—সে কাহিনী যে অন্যসুরে বাঁধা, সে যে আমার একান্ত ব্যক্তিগত। বহু রিক্ত রুক্ষতার পরে, অগ্নিস্নাত অনেক বৈশাখ পার হয়ে আমার জীবনে আসন্ন আষাঢ়ের মেঘচ্ছায়া নামলো।

দৈনন্দিন জীবনের মাঝে অবকাশ নেই, ফাঁক নেই, মণিকাদির অফিসঘরের দেয়ালে টাঙানো রুটিনের ছকের মধ্যে বন্দী আমি। ক্লাশ নেওয়া, টাস্ক দেওয়া, ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ গড়তে গিয়ে নিজের ভবিষ্যৎকে ভুলে যাওয়া, সহযোগিনীদের তুচ্ছ বৃহৎ সুখদুঃখ ব্যথাবেদনার সঙ্গিনী হওয়া—আর মাঝে মাঝে ছুটির দীর্ঘ দ্বিপ্রহরের অলস মন্থর মুহূর্তে ছোট তক্তপোষটাকে আশ্রয় করে দিবাস্বপ্ন দেখা—এই মাত্র—এইটুকু আমাদের জীবন-পরিধির সীমা।

অস্বচ্ছ আকাশতলে পাশের বক্সীপুকুরের জল শ্লেটকালো ছায়াময়, সমস্তদিন গোটাকতক অক্লান্ত পাতিহাঁস তার বুকে

টুপ টুপ ডুব দিয়ে গুগ্‌লি তোলে, কামারপাড়ার অবগুণ্ঠনবতী বৌ দু'কলসী জল নিয়ে যায় ঠিক দুপুরে। দূরে শিরীষ গাছের ঝিরঝিরে পাতার ফাঁকে গির্জার সাদা চূড়োটা দেখা যায়, ওপরে একটা পবিত্র ক্রশ, আর এক পাশে বজ্রনিরোধক তীক্ষ্ণ শলাকা। অনেক উঁচুতে চক্রাকারে চিল ওড়ে, মাঝে মাঝে রি-রি রবে ডেকে ওঠে তার রৌদ্রস্নাত বিষণ্ণ কণ্ঠ। একখানা ভারী লরী চলে যায় শহরতলীর পথ দিয়ে।

গলির মোড়ে দীর্ঘ একটানা সুরে ফেরিওয়ালা হেঁকে চলে— 'শাড়ি চাই, জামা সেমিজ শায়া—' কিংবা 'স্নো হেজলীন পাউডার রঙিন ফিতে—কাচের চুড়ি…।'

খুট করে দরজা খুলে যায়। উঁকি মারে ঘোমটা টানা ছেলেমানুষ বৌটির হাস্যোজ্জ্বল মুখ। স্বামী অফিসে, শ্বাশুড়ী নিদ্রামগ্না, দু'জোড়া কাচের চুড়ি আর একপাতা চক্‌চকে টিপ কিনবার এই তো সময়!

দুপুর গড়িয়ে বিকেল আসে, রাস্তার সরকারী কলে ভীড় করে আশপাশের বৌ-ঝিরা। কানে ভেসে আসে তাদের কর্কশ কলহের সুর। স্কুল প্রদত্ত কাঠের রুক্ষ টেবিল থেকে চায়ের কাপটা তুলে যন্ত্রের মতো চুমুক দিই।

সন্ধ্যার ছায়া নামে শহরতলীর রাস্তায়, দূরে দূরে আলো জ্বলে ওঠে, ঝিঁ ঝিঁ পোকার গুঞ্জন শুরু হয় এখানে ওখানে।

রাত বাড়ে। ঘুম নেই। পাশ ফিরতেই স্কুলের তক্তপোষটা আর্তনাদ করে উঠে। রাস্তার নিষ্প্রভ আলোর ম্লানচ্ছটা ঘরের মেঝের ওপর অসাড় মূর্ছিত প্রাণীর মতো পড়ে থাকে। দূরে গির্জার ঘণ্টা বেজে বেজে আয়ুর প্রহর ঘোষণা করে। মশারির মধ্যে কেমন যেন হাঁপিয়ে উঠি।

ঘুম নেই চোখে।

আর কত দেরি?

ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে। অনেক আকাশ পার হয়ে অনেক বর্ষা-বসন্তের সিঁড়ি মাড়িয়ে মাড়িয়ে বারতা এল।

কী সুন্দর আজকের সবুজ সকাল। চুপ করে আছি। মনের

আনাচে কানাচে গানের কলির মতো নীরব মূর্ছনা। নিচে রাস্তায় ছোট ছেলেরা কলরব তুলে খেলছে, ও-বাড়ির আলসের ধারে একটি পারাবত তার সঙ্গিনীটির চারদিকে ঘুরে ঘুরে গলা ফুলিয়ে ডেকে ডেকে মানভঞ্জনের চেষ্টা করছে। সিঁড়িতে কাদের আসা যাওয়ার পায়ের শব্দ, পাশের ঘরে কয়েকটি সহকর্মিণীর কলকণ্ঠ। ছপ্ ছপ্ শব্দ হচ্ছে বক্সীপুকুরে। কলকাতাগামী কেরাণীবাবুরা আটটার মধ্যেই পুকুরে স্নান সেরে নিচ্ছেন। পলিটিক্স থেকে পলিটেকনিক স্কুল পর্যন্ত নানা আলোচনা চলছে নানা কণ্ঠে। গামছার ওপর ভিজে কাপড়খানা জড়িয়ে ভিজে মাথায় তাঁরা একেএকে উঠে যাচ্ছেন, বাড়ি ফিরে কোনরকমে মাথা আঁচড়ে খেতে বসবেন, ব্যস্ত গৃহিণী ভাত বেড়ে তরকারি নিয়ে ছুটোছুটি করবে, এরই মধ্যে আবার টিফিনের কৌটোয় ভরে দেবে দু'খানা পরোটা আর আলুভাজা বা চিনি। রুমালে বেঁধে স্বামীর হাতে গুছিয়ে তারপরে দেবে সংসার আর ছেলেমেয়েদের জন্য টুকিটাকি জিনিষের ফর্দ।

'সাড়ে আটটা বেজে গিয়েছে। এ্যাটেনডেন্সের একটু ব্যতিক্রম হলেই 'ব্যাটারা' আবার লেট মার্ক করবে'—

'এ্যাণ্ড নিকলসনের মতো ছোটলোক অফিস আর ভূ-ভারতে নেই, বুঝলে হে চাটুয্যে—'

'কাকে বলছ দাদা? আমাদের নটিংহাম ব্যাটার আক্কেলটা একবার শুনবে? ব্যাটা যেন ওয়াইফের ব্রাদার।'

কয়েকটা উঁচুনিচু কণ্ঠ গলির মোড়ে দ্রুত মিলিয়ে যায়।

খাতার বোঝা এখনও শেষ হয়নি। লাল নীল পেন্সিলটা টেনে নিলাম, নীল দিকটা কাটাই হয়নি। পুরানো একখানা ব্লেড দিয়ে পেন্সিলের নীল দিকটা কেটে চলেছি। ছোট ছোট নীল কুচি, নীল রঙের গুঁড়ো লাগল আঙুলে। নীল রং এত সুন্দর!

আকাশটা আজ কত নীল, কত বড়!

বাসি ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে সামনের সেল্‌ফ থেকে। দুটো ফুলদানী আর একটা কাঁচের গ্লাসে একগোছা ফুল—গোলাপ রজনীগন্ধা আর পদ্ম। দেয়ালের পেরেকে ঝুলছে একটি মালা—

কামিনী ফুলের পাতার ফাঁকে ফাঁকে ফুল দিয়ে গাঁথা, শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠছে।

গতকাল চারুসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়ের মেয়েরা আমাকে বিদায় সম্বর্ধনা জানিয়েছে। আমি চলে যাচ্ছি। গান আবৃত্তি আর সম্ভাষণে অতিবাহিত হয়েছে কালকের দুটি ঘণ্টা।

আমি চলে যাচ্ছি। বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হলো শেষ।

কখন, কোন্ অলক্ষ্যে ছাত্রীদেব বন্ধনে নিজেকে নিগূঢ়ভাবে সঁপে দিয়েছিলাম জানতে পারিনি। বাঁধন ছাড়াতে গিয়ে টনটনিয়ে উঠলো দেহ-মনেব প্রতিটি অনুভূতি। মনের পটে ভেসে উঠলো গোটাকতক মুখ। ক্লাশ সেভেনের ক্ষীণতনু শুভা, প্রায় প্রতিদিন না খেয়ে শুকনো মুখে স্কুলে আসে, সৎমার স্নেহবঞ্চিত অযত্নে বর্ধিত মেয়ে, থেকে থেকে ছলছলিয়ে ওঠে ছোট্ট মুখখানা। ক্লাশ নাইনের সুশ্রী মেয়ে পঞ্চদশী মঞ্জু, কোমল সন্নত নয়ন—ওর সুমিত ব্যবহারে আমরা সকলে মুগ্ধ, ওর বুদ্ধির ওপব স্কুলের কত না আশা। ক্লাশ ফাইভে আছে মিষ্টি মেয়ে দুষ্টু মিনু। একদিন শাস্তি দিয়েছিলাম, দেয়ালের দিকে মুখ ফিবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। ক্লাশের মেয়েদের কাছে মর্যাদাহানিকর সন্দেহ নেই। কাছে গিয়ে দেখেছিলাম অতি দুষ্টু মেয়ের দু'গালে চোখের জল, মাথায় হাত দিয়েছি, কেঁপে উঠেছে ওর ক্ষুদ্র দেহটুকু। মনে পড়ে সেই পিছনের বেঞ্চিতে বসে থাকা বাসন্তীকে। বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকে, কিছু জিজ্ঞেস করলে হাসে—নিরর্থক হাসি।

মনের অনাচেকানাচে খুঁজে দেখি আর অবাক হই—কই কোথাও তো নেই কর্মজীবনের সেই দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঈর্ষা দ্বেষের এক বিন্দু অবশিষ্ট। আজকে সবাই যে আমার বড় কাছের মানুষ, বড় আপন জন। জীবনের উদ্দাম চঞ্চল শ্রেষ্ঠ দিনগুলি কেটেছে তো এদেরই সঙ্গে, তাই তো এদের ভুলতে গিয়ে কোথায় যেন ব্যথা লাগে।

'সুখী হও'—মাথা পেতে নিলাম সকলের আশীর্বাদ আর

শুভেচ্ছা। কাজলদি বুকে টেনে নিলেন, 'তোরা সুখী হ—তোদের ভালো হোক'—নিজের জীবনের একটা দিনের স্মৃতি বুঝি মনে পড়ে কাজলদির, চোখের কোণে জমে ওঠে দু'ফোটা জল। তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে মুছে ফেলে স্নিগ্ধ হাসি হাসেন—

মণিকাদি পিঠে হাত দিয়ে বললেন, 'একটা ভালো টিচার ঘরের নেশায় চাকরি ছাড়লো।' একটু হেসে বললেন, 'তার জন্য অবশ্য অভিযোগ নেই। প্রার্থনা করি তুমি সুখী হও।' মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'যেখানেই থাকো, তোমার মণিকাদির আশীর্বাদ রইলো।'

সুনয়নীদির ঘরে গিয়ে প্রণাম করলাম। মৃদুস্বরে তিনি আশীর্বাদ উচ্চারণ করে বললেন, 'যেখানেই থাকিস, সত্যকে চিনতে যেন ভুল না হয়।'

গলার কাছে কি যেন একটা ঠেলে উঠলো। মুখ লুকিয়ে গেলাম অন্য ঘরে।

'বাকি জীবন তোর আনন্দে কাটুক'—নিবিড়ভাবে হাতখানা জড়িয়ে ধরলেন জ্যোৎস্নাদি।

সুলতাদি মৃদু হেসে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ—তাঁর দুই ভ্রূর মাঝখানে কুঞ্চিত রেখা কিন্তু আর ফুটে উঠলো না।

বাড়িতে গিয়ে বুইদির সঙ্গে দেখা করে এলাম। বৃদ্ধ বয়সে অক্ষমতার যুক্তিতে বুইদিকে কর্মজীবন থেকে অবসর নেবার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে। চারুসুন্দরী স্কুলের যাবতীয় ঘটনার চলমান লিপিকার বুইদি শয্যার সঙ্গে মিশে শুয়েছিলেন। ক'দিন ধরেই নাকি বাতের ব্যথাটা আবার চাগিয়ে উঠেছে, তা ছাড়া একটু জ্বর-জ্বর ভাবও আছে। পাশে বসে কপালে হাত দিতেই চোখ মেলে তাকালেন, বিমর্ষ হাসি হেসে বললেন, 'যাবার আগে দেখা করতে এসেছিস? আশীর্বাদ করি, সুখী হ'—কাঁপা কাঁপা হাতখানা দু'হাত দিয়ে মাথায় তুলে নিলাম। বুইদির কোটরাগত চোখ দুটি জলে ভরে উঠলো, 'একেবারে ভুলিস না কিন্তু, মাঝে মাঝে আসিস।'

কথা বলতে পারছি না, অসহ্য বেদনায় আমার স্বরনালীটা

বন্ধ হয়ে আসে। কে দেখবে বুইদিকে ? শ্রান্ত রুগ্ন, অবসন্ন বুইদির বাকি ক'টা দিন কি করে কাটবে ?

গাড়ি স্টার্ট দিলো। শীলা হাতখানা আরেকবার টেনে নিয়ে বললে, 'আমাদের কিন্তু ভুলে যেও না'—।

কি যেন বলতে গেলাম—বলা হলো না, গাড়ি চলতে শুরু করেছে। মাথার পিছনে কাচের ফাঁক দিয়ে দেখলাম দোতলা থেকে তেতলায় যাবার সিঁড়ির মোড়ের ফাঁকটুকুতে সবাই এসে দাঁড়িয়েছেন—মাথা ঝুঁকে দেখছেন তাঁদের বিদায়ী সহকর্মিণীটিকে। বুঝতে পারিনি কখন কোন্ মুহূর্তগুলিতে তিল তিল করে জমে উঠেছিল এত প্রেম, এত প্রীতি। সেদিন ঝাপ্‌সা চোখে ফেলে আসা পথের দিকে তাকিয়েছিলাম আর আপন মনে বলেছিলাম, তোমাদের আমি ভালোবাসি।

গলির মোড়ে টিচার্স কোয়ার্টার্সের বাড়িটা মিলিয়ে গেল।